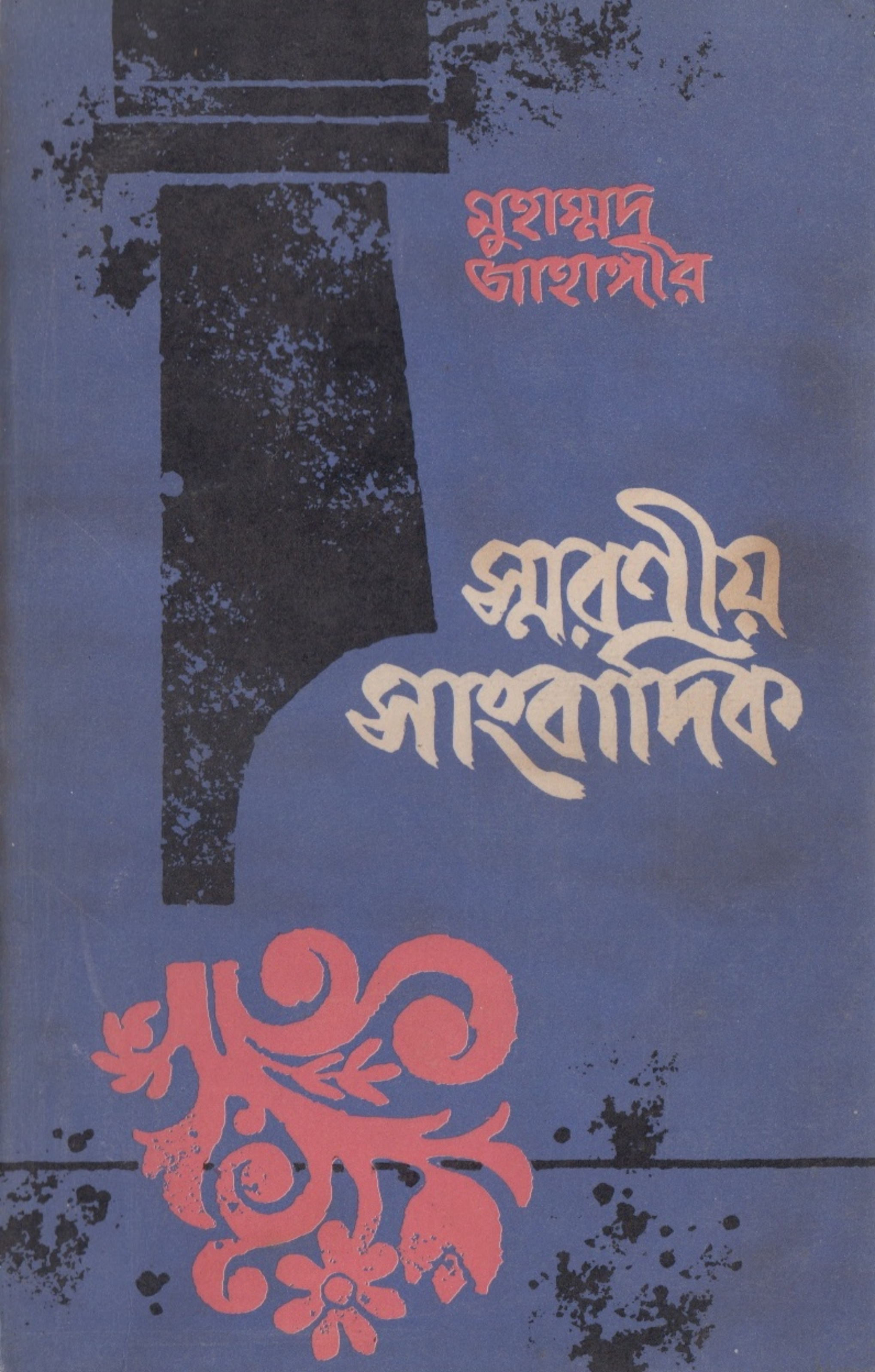

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

স্মরণীয় সাংবাদিক

স্মরণীয় সাংবাদিক

মুহাম্মদ
জাহাঙ্গীর
স্মরণীয়
সাংবাদিক

Centre for Advanced Media
(CAM)

Book No.......47

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ফাল্গুন ১৩৯১। প্রকাশক : মহিউদ্দিন আহমেদ,
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেডক্রস বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক
এলাকা, পো: বক্স ২৬১১ ঢাকা। মুদ্রণে : বর্ণমিছিল ৪২এ, কাজী আবদুর
রউফ রোড, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : বোর্ড বাঁধাই ৪৮.০০
পেপারব্যাক ৩৪.০০।

SARANIA SANGBADIK, a book on life and works of six veteran Muslim Journalists by MUHAMMED JAHANGIR. Published by the University Press Limited, 114 Motijheel Commercial Area, Post Box 2611, Dhaka 2, and printed at Barnamichhil, 42A Kazi Abdur Rouf Road, Dhaka 1. Price : Hardbound Tk. 48.00, Paperback Tk. 34.00

মোস্তফা কামাল শাহরিয়ার
ও
নজরুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ দুই সহপাঠীর
স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের নিবেদন

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অবদান অসামান্য। ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ১৯৪৭ সনে প্রথম দেশভাগের আগেই সাংবাদিকতা পেশায় তাঁদের কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেকে '৪৭ সনের পরে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দিয়েছেন।

এই দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকতা পেশায় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তাঁরা যে কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন উত্তরকালে এদেশের সাংবাদিক সমাজ তাঁদের গৌরবগাথা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করে।

এই স্মরণীয় সাংবাদিকদের মধ্য থেকে ছয়জন সাংবাদিককে নিয়ে আমার এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁরা হলেন : মৌলভী মুজিবর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম ও তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)।

স্মরণীয় সাংবাদিকের তালিকায় আরো কয়েকজনের নাম হয়তো অন্তর্ভুক্ত করা যেতো। কিন্তু নানা কারণে আপাতত এই ছয়জনকে নিয়েই গ্রন্থটি রচনা করেছি। ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে আরো কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আমাদের দেশের সাংবাদিকতা পেশা বর্তমানে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্সসহ এম. এ পাঠ্যক্রমে "সাংবাদিকতা" অন্যতম বিষয় হিসাবে পড়ানো হচ্ছে। ফলে এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাস এবং খ্যাতনামা সাংবাদিকদের জীবন ও অবদান জানার ব্যাপারে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। পূর্বসূরীদের কীর্তিগাথা উত্তরসূরীদের জানা কর্তব্যও বটে।

অতীতে সাংবাদিকতা পেশা কত কষ্টসাধ্য ছিল, পরিবেশ কত প্রতিকূল ছিল, সম্পাদককে কত ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হয়েছে, সম্পাদক কত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন—এসব নানা ঘটনা আমাদের জানা প্রয়োজন।

বর্তমান কাল মূল্যায়নের জন্যই অতীত জানা আমাদের খুবই প্রয়োজন।

এই বই খুবই সংক্ষিপ্ত একটি প্রয়াস। যে ছয়জন সাংবাদিকের জীবনী এখানে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের অবদানের তুলনায় তা যৎসামান্য। তাঁদের প্রত্যেককে নিয়ে গবেষণামূলক পৃথক গ্রন্থ রচনা করার অবকাশ আছে। কোন যোগ্য ব্যক্তি সেই কাজ একদিন করবেন বলে আমি আশাবাদী।

এই বই শুধু তাঁদের জীবন ও অবদান সম্পর্কে পাঠককে প্রাথমিক ধারণা দিতে পারবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ ছাড়া এধরনের প্রচেষ্টা এটাই প্রথম।

এই গ্রন্থ রচনার সময় প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অনেক বই ও প্রবন্ধের সাহায্য নিতে হয়েছে। যথাস্থানে সেসবের স্বীকৃতি উল্লেখিত হয়েছে। এই সুযোগে আমি সংশ্লিষ্ট বইগুলোর লেখকদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইয়ের পরিশিষ্ট হিসেবে আলোচিত ছয়জন সাংবাদিকের ছয়টি লেখা সংযোজন করা হল। এর উদ্দেশ্য : তাঁদের রচনার সংগে নবীন পাঠকদের পরিচয় করিয়া দেয়া। লেখাগুলো কোন বিশেষ মাপকাঠিতে নির্বাচন করা হয়নি। শুধু তাঁদের রচনার মান ও শক্তি অনুভব করা যায়, সেরকম লেখাই নির্বাচন করা হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের জনাব মহিউদ্দিন আহমদের আগ্রহে এই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। একসময় সক্রিয় সাংবাদিকতা করেছেন বলেই হয়তো তিনি বইটি প্রকাশে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বইটির প্রেস কপি তৈরী করার সময় সহকর্মী রেহানা আখতার আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

যেসব মনীষী ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তির শ্রমে ও প্রজ্ঞায় আমাদের দেশে সাংবাদিকতা পেশা আজ একটা সম্মানজনক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার বিনীত অর্ঘ।

২০ লেক সার্কাস
কলাবাগান, ঢাকা ৫
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

সূচী

মৌলভী মুজিবর রহমান ১
মওলানা আকরম খাঁ ৮
আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৪
আবুল মনসুর আহমদ ২৫
আবদুস সালাম ৩৫
তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ৪৬
পরিশিষ্ট ৫৫

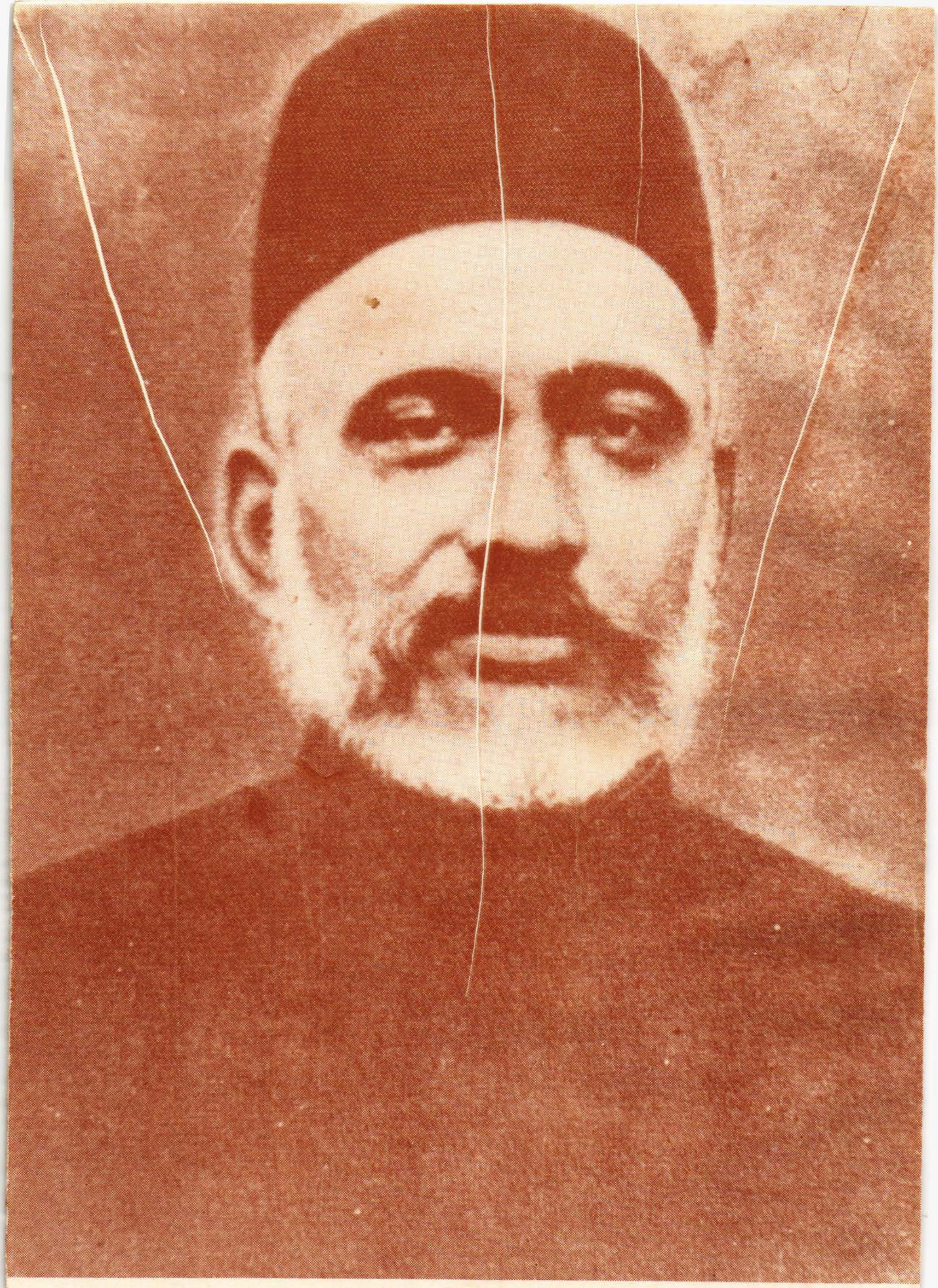

মুজিবর রহমান

(১৮৬৯-১৯৪০)

মৌলভী মুজিবর রহমান

বৃটিশ আমলে যে স্বল্প কয়েকজন মুসলমান সাংবাদিকতা পেশায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন মৌলভী মুজিবর রহমান (১৮৬৯-১৯৪০) তাঁদের অন্যতম। তখনকার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান'-এর সম্পাদক হিসেবেই প্রধানত তাঁর খ্যাতি। তখনকার দিনে সাংবাদিকতা শুধু জীবন যাপনের জন্য একটি পেশা ছিল না। বৃটিশ আমলে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে আলোকিত করা ও মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করাও ছিল কিছু কিছু সংবাদপত্রের দায়িত্ব। মুজিবর রহমান রাজনীতি ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসাবে দেশের স্বাধীনতা ও মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য সাংবাদিকতা পেশা বেছে নিয়েছিলেন। সেই ত্রিশ চল্লিশের দশকে মুসলমান সমাজের একটা বড়ো অংশ শিক্ষা বঞ্চিত ছিল। শুধু শিক্ষায় নয়, রাজনৈতিক চেতনা ও আর্থিক অবস্থায়ও মুসলমান সমাজ পিছিয়ে ছিল। এই পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের জন্য ইংরেজী ভাষাতে পত্রিকা বের করার কারণ ছিল, ইংরেজী ভাষাতে মুসলমানদের অভাব অভিযোগের কথা ইংরেজ সরকারের কানে পৌঁছানো। তখন মওলানা আকরম খাঁ'র সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' বাংলা সাংবাদিকতার দাবী অনেকটা পূরণ করেছিল।

মুজিবর রহমান প্রমুখের মুসলমান স্বার্থ চিন্তার প্রকাশ দেখে কারো কারো মনে হতে পারে তাঁরা খুব সাম্প্রদায়িক ছিলেন। কিন্তু তা সত্য নয়। সে যুগে মুসলমান নেতাদের মধ্যে অনেকেই প্রগতিশীল ছিলেন। তাঁরা দেশের সমৃদ্ধির সংগে সংগে নিজের সমাজের সমৃদ্ধির কথাও ভাবতেন। তবে তা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

মুসলমান সমাজকে আলোকিত করা ও মুসলমান সমাজের উপর অবিচার অন্যায়ের কথা ইংরেজ সরকারকে সবসময় অবহিত রাখা—প্রধানত এই দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' প্রকাশনার পরিকল্পনা হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সেযুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা আবদুর রসুল, বর্ধমানের আবুল কাসেম, ময়মনসিংহের আবদুল হালিম গজনভী। পত্রিকা প্রকাশের দুরূহ দায়িত্ব অর্পণের জন্য তাঁরা খুঁজে বের করেন যুবক মুজিবর রহমানকে। মুজিবর রহমান উচ্চশিক্ষিত কোন ব্যক্তি নন। তবে সেকালে ইংরেজী ভাষায় লেখা তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ মননশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুন্দর ও নির্ভুল ইংরেজী লেখার জন্য তিনি সেকালে আদৃত হয়েছিলেন। তিনি প্রধানত স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত 'বেংগলী' পত্রিকায় লিখতেন।

যেহেতু মুসলমানদের কথা বলার জন্য এই পত্রিকার উদ্যোগ, সেহেতু পত্রিকার নামই রাখা হল 'দি মুসলমান'। ১৯৩৬ সনের ৬ ডিসেম্বর 'দি মুসলমান' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম দিকে আবুল কাসেম হলেন এর সম্পাদক ও মুজিবর রহমান হলেন ম্যানেজার। কিন্তু আবুল কাসেম পত্রিকার জন্য বেশী সময় দিতে না পারায় মুজিবর রহমানই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুজিবর রহমান শুধু সম্পাদনার দায়িত্বই নেননি, তিনি এই পত্রিকার মুদ্রাকর, প্রকাশকও ছিলেন। রফিকুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবু লোহানী প্রমুখ ছিলেন তাঁর সহকর্মী।

কলকাতার ১৭৬৩-এ বৌবাজার স্ট্রীটে একটি ছোট ঘরে ছিল 'দি মুসলমান'-এর অফিস। পরে অবশ্য নানা কারণে, প্রধানত অর্থ সংকটের জন্য পত্রিকার অফিস নানা জায়গায় বদল হয়।

প্রকাশের পর থেকে 'দি মুসলমান' পাঠক সমাজে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে। ইংরেজী শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মুসলমানদের ঘরে 'দি মুসলমান'ই শোভা পেতো। যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়েছিল তা ফুটে উঠেছিল তার লেখনীতে। সেই প্রবল প্রতাপের ইংরেজ শাসনের যুগে মুজিবর রহমান ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। লেখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভিক। যা সত্য বা ন্যায় বলে জানতেন তা প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। তাই

মুসলমান সমর্থক পত্রিকা হলেও অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল পাঠকেরা এই পত্রিকা শ্রদ্ধার সংগে পড়তেন। সম্পাদক হিসেবে মুজিবর রহমান যে অত্যন্ত সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ কারো ছিল না। তাঁর নির্ভেজাল ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমই তাঁকে আদর্শনিষ্ঠ সম্পাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সত্য প্রকাশের জন্য 'দি মুসলমান' পত্রিকাকে সহ্য করতে হয়েছিল ইংরেজ সরকারের দমননীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুজিবর রহমান "ইংল্যাণ্ড, টার্কি এণ্ড ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্" শীর্ষক ধারাবাহিক সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তার ফলে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল নিগ্রহ। বৃটিশ সরকার তাঁর পত্রিকার কাছে জামানত তলব করেন আর নির্দেশ দেন 'অতঃপর আগাম সরকারী অনুমোদন ছাড়া কোন সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'দি মুসলমান'-এ ছাপা যাবেনা।' এ নিয়ে সংবাদপত্র মহলে তুমুল ঝড় উঠেছিল। মুজিবর রহমান সরকারী নির্দেশের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি সম্পাদকীয় ছাড়াই অর্থাৎ সম্পাদকীয় কলাম খালি রেখে পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। পরে অবশ্য সরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর আগেও একবার 'দি মুসলমান' ইংরেজ সরকারের রোষের শিকার হয়েছিল। ১৯১৩ সনের নভেম্বর মাসে 'দি মুসলমান' অফিসে খানাতল্লাশী হয় এবং পত্রিকার সাতটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। কারণ ঐ সংখ্যা গুলোতে কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত বলকান যুদ্ধের অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল।

১৯২৫ সালে মুজিবর রহমান 'দি মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানী' নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠন করলেন। এ সময় 'দি মুসলমান' পত্রিকাকে সাপ্তাহিক থেকে 'ট্রাই উইকলি' অর্থাৎ সপ্তাহে তিনবার প্রকাশনার ব্যবস্থা করলেন। পত্রিকার ভাষা ইংরেজী বলে মুসলমান সমাজে 'দি মুসলমান'-এর পাঠক ছিল সীমিত। তাই মুজিবর রহমান একটা বাংলা পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯২৬ সনে সাপ্তাহিক 'খাদেম' প্রকাশিত হল। 'খাদেম' সম্পাদনার ভার দেয়া হল আবুল মনসুর আহমদকে।

১৯৩০ সালে 'দি মুসলমান' দৈনিকে রূপান্তরিত হল। সেই সংগে বাড়লো প্রচুর খরচ। কর্তৃপক্ষ সেই খরচ কিছুতেই পোষাতে পারছিল না।

ফলে পত্রিকার জীবনে নেমে এল দারুণ বিপর্যয়। ১৯৩৫ সনে 'দি মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড' দেনার দায়ে লিকুইডেশনে গেল। দি নিউ মুসলিম মজলিশের খাজা নুরুদ্দিন 'দি মুসলমান'-এর গুডউইলটা কিনে নিলেন এই শর্তে যে, মুজিবুর রহমানই 'দি মুসলমান'-এর সম্পাদক থাকবেন এবং তাঁর সম্পাদকীয় নীতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবেনা। কিন্তু নতুন মালিক কথা রাখতে পারেননি। মুজিবর রহমানের সংগে তাঁর বনিবনা হলোনা। একদিন অপমানের গ্লানি মেখে মুজিবর রহমানকে চলে আসতে হল তাঁর স্বপ্নের 'দি মুসলমান' ছেড়ে। আর ১৯৩৬ সালেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। হতাশ, হতোদ্যম নির্ভীক সাংবাদিক মুজিবর রহমান কোলকাতার কোলাহল ছেড়ে ভগ্ন মন নিয়ে ফিরে গেলেন গ্রামের বাড়ী নেহালপুরে। উন্মুক্ত প্রান্তরে খড়ের ছাওয়া একটা ছোট বাড়ী বানালেন। সিদ্ধান্ত নিলেন সেখানেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। সেই কুটিরের নাম দিলেন : 'দি রিট্রিট'।

কিন্তু সাংবাদিকতা যে শুধু পেশা নয়, নেশাও। তা কি সহজে ছাড়া যায়? ছোট ভাইয়ের উদ্যোগে ও উৎসাহে সেই বছরেই মুজিবর রহমানের সম্পাদনায় ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কমরেড' প্রকাশিত হল। কিন্তু পত্রিকাটি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

মুজিবর রহমানের আদি পরিবার পশ্চিম বংগের বর্ধমান জেলার রসুলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের বংশধররা চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় এসে বসবাস করেন। ১৮৬৯ সনে মুজিবর রহমান বসিরহাট মহকুমার নেহালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী এলাহি বখ্শ, মুজিবর রহমানের বয়স যখন এগার তখন তাঁর বাবা মারা যান। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন মেধাবী। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (বর্তমানের এস এস সি) তিনি দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেছিলেন। এন্ট্রান্স পাস করার পর মুজিবর রহমান কলকাতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ (বর্তমানের আই, এ) ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক নানা সমস্যায় তাঁর পক্ষে আর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই জীবিকার তাগিদে তাঁকে গ্রামে ফিরে আসতে হলো। গ্রামে এসে তিনি চাকুরী নিলেন পেশকারের। কিন্তু পেশকারের চাকরী তাঁর ভালো লাগলোনা। কারণ শৈশব থেকে তাঁর চরিত্র গড়ে উঠেছিল অন্যভাবে। তিনি ছিলেন স্বাধীনমনা, সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাই পেশকারের চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভাব-

লেন স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গেলেন কলকাতায়। কলকাতায় বৌবাজারে খুললেন এক স্টেশনারী দোকান। কিন্তু পুঁজি কম ছিল বলে ব্যবসা তেমন জমাতে পারলেননা। ব্যবসা করলেও মুজিবর রহমানের মনের মধ্যে ছিল আগুন। তিনি আর দশজন ব্যবসায়ীর মত শুধু আত্মউন্নতি নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। দেশের সমস্যার কথা তাঁকে সবসময় পীড়িত করতো। তখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সম্পাদিত 'দি বেংগলি' পত্রিকাটি ছিল খুবই জনপ্রিয়। মুজিবর রহমান ভাল ইংরেজী জানতেন। আর তাই ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'দি বেংগলি' পত্রিকাতে নানা বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। বিশেষ করে পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে। মুজিবর রহমানের সুচিন্তিত ও সুলিখিত চিঠি সম্পাদক স্যার সুরেন্দ্র নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মুজিবর রহমানকে ডেকে লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। এভাবেই মুজিবর রহমান ইংরেজী সাংবাদিকতার দিকে উৎসাহী হন।

কালক্রমে মুজিবর রহমান 'দি মুসলমান' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯০৬-১৯৩৬ সন পর্যন্ত তিনি 'দি মুসলমান'-এর সম্পাদনার সংগে জড়িত ছিলেন।

একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি সেকালে সারা ভারতবর্ষে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সততা, সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িকদের কাছে নানা ঘটনার কথা জানা যায়।

মুজিবর রহমান ১৯২১ সনে অসহযোগ—খিলাফত অন্দোলনের সংগেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা। বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংগেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতি হয়েছিলেন। রাজনীতির সংগে সংগে তিনি তাঁর পেশার সংগ্রামের কথা ভোলেননি। তিনি "নিখিল ভারত সাংবাদিক সমিতির" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন। খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অভিযোগে তিনি ১৯২১ সনের ৯ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন ও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

রাজনীতির সংগে তাঁর এতোটা যোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা সাংবাদিকতার কাজটাকেই বড়ো করে দেখেছেন। সম্পাদকের দায়িত্ব পালনই ছিল তাঁর মনের সবচে বড় তাগিদ। একজন সৎ দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর

জীবনে নানা সরকারী পদ নেবার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু কোনটাই তিনি গ্রহণ করেননি। যেমন তদানীন্তন বংগীয় আইন সভার সদস্যপ্রার্থী হবার জন্য মুজিবর রহমানকে অনুরোধ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। কলকাতা করপোরেশনের সম্মানিত মেয়র হবার জন্যও তাঁকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। প্রথমে একবার রাজী না হলেও পরে ১৯৩১ সনে যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের অনুরোধে কলকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান পদটি দুই টার্মের জন্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

'দি মুসলমান' বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি গ্রামের বাড়ীতে বসবাস করছিলেন। একদিন রাতে বাসায় ভাত খাওয়ার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁর ডান হাত অবশ হয়ে গেল। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা নিয়ে আসা হয়। কিন্তু অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে লাগল। কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। তাঁর অসুস্থতার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ভক্ত পাঠক, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী আমলা, শুভানুধ্যায়ী অনেকেই তাঁকে দেখতে এলেন। দেখতে এলেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। তখন মুজিবর রহমানের অবস্থা আশংকাজনক পর্যায়ে। কথা বলতে পারেননা। শরীর অবশ হয়ে গেছে। শুধু ইশারায় মনের ভাব ব্যক্ত করেন। সে যাত্রা তিনি কোনভাবে বেঁচে উঠলেন।

১৯৪০ সনের ২৬ এপ্রিল মুজিবর রহমান আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাথায় রক্তক্ষরণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা খবর পেয়ে ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন। কিন্তু কোনরকম চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে মুজিবর রহমান নিঃশব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এভাবেই প্রস্থান করলেন মুসলিম সাংবাদিকতার এক মহান স্থপতি।

তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচারিত হলে দেশের বিদ্যোৎসাহী সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ মরহুমের জানাজায় ইমামতি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আসতে দেরী হওয়ায় মওলানা আকরাম খাঁ জানাজার নামাজ পড়ান।

নেহালপুরে মায়ের কবরের পাশে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

১৯৪০-এর ১০ মে নেহালপুরে তাঁর প্রথম স্মৃতিসভায় সুভাষচন্দ্র বসু এক বাণীতে বলেছিলেন : 'আমাদের এই অভাগা পরাধীন দেশে খাঁটি মানুষ খুবই বিরল। যে কয়জন খাঁটি মানুষ পাওয়া যায় তাঁরাই আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেব ঐ বিরল মানুষদের মধ্যে

একজন ছিলেন। আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই রকম মানুষ খুব কমই দেখেছি একথা লৌকিকতা নয়, ইহা আমার প্রাণের কথা।" (সংক্ষেপিত)

মুজিবর রহমান আজ এদেশের সাংবাদিক তথা পাঠক সমাজে প্রায় অপরিচিত এক নাম। 'দি মুসলমান' পত্রিকার কথাও এই প্রজন্মের অনেকেই জানেন না হয়তো। কিন্তু এই পেশায় মুজিবর রহমান সর্বকালের জন্য একটি শ্রদ্ধেয় নাম। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত 'দি মুসলমান'-এর ত্রিশ বছরের ফাইল ইংরেজী সাংবাদিকতা ও স্বদেশপ্রেমের সেই গৌরবোজ্জ্বল কালকে ধরে রেখেছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সাংবাদিক মুজিবর রহমান। আবুল ফজল। বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৬৭।
২. ছোটদের মৌলভী মুজিবর রহমান। আমিনুর রহমান। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ডিসেম্বর, ১৯৮২।

মওলানা আকরম খাঁ

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে (১৮৬৮-১৯৬৮) মুসলিম সাংবাদিকতার জনক বলা হয়। সাংবাদিকতা পেশায় মুসলমানদের আকৃষ্ট করার পেছনে তাঁর কৃতিত্ব প্রায় একক বলা যায়।

মওলানা আকরম খাঁ সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে এক প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সাহিত্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি সাংবাদিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বাঙালী মুসলমানের জীবনে তিনি ছিলেন প্রবল প্রতাপী এক পুরুষ। পাকিস্তান আন্দোলনে ও বৃটিশ আমলে মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে ক'জন মুসলমান নেতা সক্রিয় ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ তাঁদের অন্যতম। তাঁর অস্ত্র ছিল সংবাদপত্র ও সাময়িকী। পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি সেকালে লড়াই করেছিলেন। রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে বাংলা ১২৭৫ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ আকরম খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মওলানা আবদুর বারী ও মায়ের নাম রাবেয়া খাতুন। ছেলেবেলায় আকরম খাঁ গ্রামের মক্তব, হাই স্কুল ও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। ইংরেজী ১৯০১ সালে তিনি ফাজেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এ পর্যন্তই। তারপরেই কর্মজীবন শুরু।

আকরম খাঁ যে যুগে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন ছিল ইংরেজ বিদ্বেষের যুগ। রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে স্বাভাবিকভাবে আকরম খাঁ'র

মনেও ইংরেজ বিদ্বেষের আগুন জ্বলছিল। একদিকে ইংরেজ শাসন অপরদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য। তখন মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায় শিক্ষাদীক্ষা, চাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য সবদিক দিয়ে অনেক এগিয়ে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই পিছিয়ে থাকা অবস্থা আকরম খাঁকে ব্যথিত করে। তিনি লক্ষ্য করলেন, মুসলমানরা নিজেদের উন্নতিতে মন না দিয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা ও নানা খুঁটিনাটি নিয়ে মেতে আছেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সভায় সমাবেশে বক্তৃতা করা শুরু করলেন। উত্তরকালে মওলানা আকরম খাঁ যে একজন অনলবর্ষী বক্তা হয়েছিলেন তার সূচনা হয়েছিল এভাবেই।

সমাজ সেবা করতে গিয়ে তিনি একটি মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। আর সেই মাধ্যম হিসেবে তিনি সংবাদপত্র প্রকাশের কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু এ কাজে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

কলকাতায় আবদুল্লাহ্ নামে এক ব্যক্তি 'মাসিক মোহাম্মদী' নামে এক কাগজ বের করতেন। আকরম খাঁ সেই কাগজের সংগে যুক্ত হলেন। একবার এক লেখা নিয়ে পুলিশী ঝামেলা হলে বিরক্ত হয়ে তিনি কাগজটি বন্ধ করে দিতে চাইলেন। আর এই সুযোগে আকরম খাঁ পত্রিকাটির স্বত্ব চেয়ে নিলেন। আর এভাবেই ১৯১১ সালে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' প্রকাশনা শুরু হয়। আর সেই সংগে শুরু হয় আকরম খাঁর সাংবাদিক জীবন। যা কালক্রমে এক বিরাট ইতিহাসে পরিণত হয়।

অচিরেই 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' বাঙলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশের (বার্মা) মুসলমানদের প্রিয় পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' মুসলমানদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে বহু তরুণ মুসলমান এসে যোগ দিলেন। ক্রমে ক্রমে মুসলমান তরুণরা সাংবাদিকতা পেশায় আগ্রহী হতে থাকে।

একদিকে সাংবাদিকতা অপরদিকে রাজনীতি। আকরম খাঁ দুদিকেই সমান সক্রিয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন গরম ইস্যু হল বংগবিভাগ। এই বংগবিভাগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আকরম খাঁ কংগ্রেসের সংগে যুক্ত হলেন। তিনি 'নামকাওয়াস্তে' রাজনীতি করতেন না। কংগ্রেসের তিনি খুব প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। এক সময়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের

সভাপতিও ছিলেন। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি তিনি বেশ কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলনের সময় তিনি একবার গ্রেপ্তার হন। তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ ছিল একটি সম্পাদকীয়। ঐসময় তিনি মোহাম্মদী ছাড়াও উর্দুতে 'দৈনিক জমানা' ও বাংলায় 'দৈনিক সেবক' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সময় তিনি দৈনিক সেবক-এ "অগ্রসর অগ্রসর" শিরোনামে যে উত্তেজনামূলক সম্পাদকীয় লেখেন তার মাশুল হিসেবে তাঁকে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কারাগারে তিনি কোরআন শরীফের শেষ পারা 'আমপারা' অনুবাদ করেন।

আকরম খাঁ কারাগারে থাকার সময়ই দৈনিক সেবক বন্ধ হয়ে যায়। তখন কর্তৃপক্ষ আরেকটি দৈনিক প্রকাশের কথা চিন্তা করলেন। নতুন কাগজের ডিক্লারেশন পাওয়া যাবেনা বলে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করা হল। পত্রিকায় লেখা হল 'সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ' (বর্তমানে কারাগারে)। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেন। 'দৈনিক মোহাম্মদীর' ও 'সেবক'-এর সংগে কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ জড়িত ছিলেন।

১৯২০-৩০ সনের মধ্যে আকরম খাঁ'র উদ্যোগ ছাড়াও আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কোনটি বেশীদিন টেকেনি। একমাত্র 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' মুসলমানদের কণ্ঠস্বর হিসেবে আকরম খাঁর যোগ্য নেতৃত্বে বহু দিন টিকে ছিল।

সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ছিল সংবাদ প্রধান সাময়িকী। তাই এই সাপ্তাহিকে সাহিত্য চর্চার সুযোগ ছিল সীমিত। মওলানা আকরম খাঁ তখন মুসলমান লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রকাশনা শুরু করেন। 'মাসিক মোহাম্মদী'তে মুসলমান লেখকরা নানা বিষয়ে লিখতে শুরু করেন। তখনকার পরিবেশ আজকের মত এত উদার বা পরিচ্ছন্ন ছিলনা। জীবনের নানা ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান বিরোধ লেগেই থাকতো। তখনকার হিন্দু প্রধান পত্রিকা যেমন: আনন্দবাজার, বসুমতি, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকার কোন কোন ভূমিকা, মতামত, ভাষা মুসলমানরা পছন্দ করতে পারেননি। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি নানা প্রশ্নে হিন্দু মুসলমানের দু'টি পৃথক দৃষ্টিভংগী ছিল। হিন্দু প্রধান পত্রিকাগুলোর লেখার

জবাব দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' ইত্যাদি।

যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে তখন মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত অবহেলিত ছিল। এসময়ে মওলানা আকরম খাঁর এই ভূমিকা কারে কারো কাছে সাম্প্রদায়িক মনে হতে পারে। এ প্রসংগে এক প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন: "অনেক সময় তিনি অতিরিক্তভাবে সাম্প্রদায়িক হয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক হিন্দুর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মুসলমান হয়েছেন। অনেক দূরবর্তী হলেও আমরা এখনও অনুভব করতে পারি যে সেই মুহূর্তে মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য এই সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন ছিল।" (বই, আষাঢ় ১৩৯০, পৃঃ ৩)

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪০ সাল সময়কাল উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণ নানা ঘটনায় সমৃদ্ধ। এ সময় কংগ্রেস হিন্দুঘেঁষা রাজনৈতিক দল হয়ে পড়েছে—এই অভিযোগে বহু বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস ছেড়ে দিতে শুরু করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলিম লীগকে পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে মুসলিম নেতাদের মুসলিম লীগে যোগদানের আবেদন জানান। মওলানা আকরম খাঁও কংগ্রেস-এর প্রতি বিরূপ হয়ে ঐসময় মুসলিম লীগে যোগ দেন। আগের মতো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়েই আকরম খাঁ মুসলিম লীগের কাজ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মুসলিম লীগের রাজনীতি করতে এসেই মওলানা আকরম খাঁ 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশ করলেন। ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর কলকাতা থেকে দৈনিক আজাদ আত্মপ্রকাশ করলো। সেই 'দৈনিক আজাদ' আজও ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

মওলানা আকরম খাঁ যদি আজ ইতিহাস হন তাহলে বলা যায় 'দৈনিক আজাদ' আরেকটি পৃথক ইতিহাস। সেকালে অর্থাৎ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলায় "দৈনিক আজাদ" স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজো নজিরবিহীন। সেকালের বাঙালী মুসলমানরা 'আজাদ'-এর প্রতি তাই আজো ঋণী। প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যে 'আজাদ'-এর পাঠক সৃষ্টি হতে লাগল শহর ছাড়িয়ে মফস্বলে, গ্রামে-গ্রামান্তরে।

তখন মুসলমানদের কাছে নেতা হল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পত্রিকা হল 'দৈনিক আজাদ', ফুটবল ক্লাব হল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আর লক্ষ্য হল মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি অর্থাৎ পাকিস্তান কায়েম। অবশ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য হেতু মুসলমানদের একটা অংশ এভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি পছন্দ করেনি। তবে সত্যের খাতিরে বলা দরকার, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর আকরম খাঁর 'আজাদ' পত্রিকা ছিল তাঁদের মুখপত্র।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান কায়েম হবার পরও 'দৈনিক আজাদ' ১৯৪৮ সালের ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এক সপ্তাহ পত্রিকা বন্ধ থাকার পর ১৯শে অক্টোবর ঢাকা থেকে 'দৈনিক আজাদ'-এর পুনরায় প্রকাশনা শুরু হয়।

ঢাকায় আসার পর মওলানা সাহেব কয়েক বছর মুসলিম লীগের সংগে সংশ্রব রাখেন। তিনি পাকিস্তানের পার্লামেন্ট সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে নতুন করে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি আর সেই দলে যাননি। এভাবেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। শেষ জীবনে 'দৈনিক আজাদ' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পরিচালনার সংগে যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে 'আজাদ' সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। এবং উত্তরকালে তিনি 'আজাদ' সম্পাদক হিসাবেই খ্যাতি লাভ করেন।

মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদকের কাজটা খুব গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন। শুধু প্রিন্টার্স লাইনে নাম ছাপিয়ে কাগজের শোভা বাড়িয়ে সম্পাদক আকরম খাঁ সন্তুষ্ট ছিলেন না। সহকর্মীদের মতে, তিনি ছিলেন 'কড়া সম্পাদক'। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি প্রতিদিন 'আজাদ' পত্রিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। মিলিয়ে দেখতেন ঢাকা, কলকাতা, করাচীর অন্যান্য দৈনিকের সংগে। প্রতিদিনের 'আজাদ'-এ তিনি অনুবাদের ভুল, বাক্যগঠনের ভুল, বানানের ভুল, হেডিং-এর ভুল, তথ্যের ভুল বা অসম্পূর্ণতা সবকিছু লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতেন। এসব ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে জবাবদিহি করতে হতো।

তিনি শুধু নামের খাতিরে সম্পাদক ছিলেন না। 'আজাদ' কর্মীগোষ্ঠীকে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বের জোরেই 'দৈনিক আজাদ' সেকালে একটি বিশিষ্ট দৈনিকে পরিণত হয়েছিল।

সাংবাদিকদের পেশাগত আন্দোলনে মওলানা আকরম খাঁ সবসময় সমর্থন দিয়েছেন ও অংশগ্রহণ করেন। এমনকি জীবন সায়াহ্নে ১৯৬২ সনে তিনি কালাকানুনের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের এক মিছিলে গাড়ীতে চড়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রাজপথে সাংবাদিকদের সেই ঐতিহাসিক মিছিল অনেকের কাছে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে।

সাহিত্য কর্মেও মওলানা আকরম খাঁর অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার ফলে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কোরআন শরীফের প্রাঞ্জল অনুবাদ। তবে তাঁর বিশেষ অবদান হল 'মোস্তফা চরিত' (১৯২৩) গ্রন্থখানি। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর জীবনী, মেধা, পাণ্ডিত্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে বহু প্রচলিত গল্প ও ধারণাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছেন। এতে বইটি নিয়ে সামান্য বিতর্কও সৃষ্টি হয়। কিন্তু যুক্তিবাদী ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে 'মোস্তফা চরিত' বরাবরই আদৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই বইটি এক অমূল্য সম্পদ। এছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত তাঁর মননশীল প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। শেষ জীবনে তাঁর ইচ্ছে ছিল "মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস" লিখবেন। কিন্তু সেই সুযোগ আর তিনি পাননি।

দীর্ঘায়ু বলতে যা বোঝায় মওলানা আকরম খাঁ তাই লাভ করেছিলেন। জীবিতকালে বেশ ঘটা করে তাঁর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। কিন্তু তারপর মাত্র কয়েক মাস তিনি বেঁচেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট ঢাকায় নিজ বাসভবনে মওলানা আকরম খাঁ ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী বংশাল আহলে হাদিস মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁর লাশ সমাহিত করা হয়।

মওলানা আকরম খাঁ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা, মননশীলতা ও মুসলমান সম্প্রদায়কে সাংবাদিকতা পেশায় অনুপ্রাণিত করার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

জীবিতকালেই যিনি 'সম্পাদক' হিসেবে কিংবদন্তীর মতো খ্যাত হয়েছিলেন—তিনি আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৮৯৭-১৯৭৭)। সাংবাদিক জগতে তিনি ছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। একালের অনেকেই প্রায় আবাল্য তাঁর নামের সংগে পরিচিত। অনেকের শৈশবের স্মৃতিতে খবরের কাগজের সম্পাদক মানেই আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তাঁর এই ব্যাপক পরিচিতির কারণ কি? কারণ সেকালে এত দীর্ঘ সময় ধরে আর কোন সাংবাদিক একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেননি। তাও নগণ্য কোন দৈনিক নয়। 'আজাদ'-এর মতো প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় দৈনিক। দৈনিক আজাদ (প্রকাশকাল ১৯৩৬) মাওলানা আকরম খাঁ'র পত্রিকা হলেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৯৪০ থেকে ১৯৬২ সন পর্যন্ত একটানা 'আজাদ'-এর সম্পাদক ছিলেন। আর ঐ কালটা ছিল উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচে উত্তপ্ত সময়। চল্লিশের দশকে দৈনিক 'আজাদ' ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একক কন্ঠস্বর। সেই 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ফলে সম্পাদক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা সেই চল্লিশের দশক থেকে শুরু। ১৯৬২ সনে তিনি যখন 'আজাদ' সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন তখন তিনি সম্পাদক হিসেবে একটি বড় 'প্রতিষ্ঠানে' পরিণত। সম্পাদক হিসেবে তিনি পাঠক তথা দেশবাসীর যে আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন তা সত্যি বিরল।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহিত্যিক হিসেবেও নন্দিত। সাংবাদিকতায় আসার অনেক আগেই তিনি একজন সাহিত্য সমালোচক হিসেবে

বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি যদি সাংবাদিকতা পেশায় নাও আসতেন তবু একজন সাহিত্য সমালোচক ও অনুবাদক হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে থাকতো। সাহিত্যচর্চা করলেও, সাংবাদিকতাকেই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সাংবাদিক হিসেবেই তিনি বেঁচে থাকবেন। একজন সূক্ষ্মদর্শী অগ্রণী সমালোচক এবং দক্ষ অনুবাদক হিসেবেও তিনি হয়ে থাকবেন স্মরণীয়।

১৮৯৭ সালের ৩রা নভেম্বর ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের জন্ম। তাঁর বাবার নাম মোহাম্মদ শাহেদুল্লাহ, মায়ের নাম জয়নাব খাতুন। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বাড়ীতে আরবী, ফার্সী ও পুঁথি সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল। কৈশোরেই পুঁথি সাহিত্যের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে। এসময় তিনি আধুনিক সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং কৈশোরেই সাহিত্য চর্চায় মন দেন। স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্কুল জীবনেই তাঁর লেখা নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্কুলের লেখাপড়া করেন ময়মনসিংহে। কিন্তু এনট্রান্স পরীক্ষা দেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে। তিনি ১৯১৭ সালে এনট্রান্স পাশ করেন। ময়মনসিংহে গ্রামীণ পাঠশালায় তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালে খ্যাত আবুল মনসুর আহমদ। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ইন্টারমেডিয়েট পড়েন ঢাকা কলেজে। বি, এ, পড়ার জন্য ভর্তি হন কলকাতার রিপন কলেজে। তখন অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে সারাদেশে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত। যে যেভাবে পারছে সেভাবেই ইংরেজদের সংগে অসহযোগিতা করছে। দেশপ্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীনও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বৃটিশ প্রতিষ্ঠিত কলেজ থেকে ডিগ্রী না নিয়ে ১৯২১ সালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি গৌড়ীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রজীবন থেকেই আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্যিক সত্তা ছিল খুব সক্রিয়। তখন কলকাতা থেকে নানা ধরনের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেসব কাগজে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লেখালেখি শুরু করেন ছাত্রাবস্থাতেই। সেসব লেখা ছিল সাহিত্য সমালোচনামূলক।

সেকালে 'প্রতিভা', 'আল এসলাম', 'সওগাত', 'বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি অনেকগুলো সাড়া জাগানো প্রবন্ধ লেখেন এবং একজন সমালোচক হিসেবে নন্দিত হন।

লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে অনেকটা স্বীকৃতি লাভের পর তিনি সাংবাদিকতা পেশার সংগে যুক্ত হন। ১৯২২ সালে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রত্যক্ষ সাংবাদিক জীবনের সূচনা ঘটে। প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় মওলানা আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'দৈনিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। এরপর ভিন্ন সময়ে 'দৈনিক সেবক', 'মাসিক সওগাত', 'সাপ্তাহিক সওগাত', 'দৈনিক সোলতান', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। এর মধ্যে কিছুকাল তিনি মৌলভী মুজিবর রহমানের 'দি মুসলমান' নামক ইংরেজী পত্রিকায়ও কাজ করেন। একদিকে বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করে তিনি যেমন সাংবাদিক হিসেবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি 'সওগাত'সহ অন্যান্য পত্রিকায় লিখে তিনি সাহিত্য পাঠকদেরও মনোযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনা সেকালে সাহিত্য ভুবনে আলোড়ন তুলেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মুসলিম সমাজের বক্তব্য বলার জন্য যে কাগজটি প্রথম বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তার নাম 'দি মুসলমান' (১৯০৬)। এরপর বিভিন্ন সময়ে আরো কয়েকটি পত্রিকা পর পর প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার মধ্যে 'নবযুগ', 'সেবক', দৈনিক সুলতান', 'দৈনিক ইত্তেহাদ', 'দৈনিক কৃষক' উল্লেখযোগ্য। এর কোনটিই বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল 'দৈনিক আজাদ'। মওলানা আকরম খাঁ'র মালিকানায় ও সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর আগেই আকরম খাঁ'র পত্রিকা 'দৈনিক মোহাম্মদী', 'সেবক', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' ও মাসিক পত্রিকা 'মোহাম্মদী'র সংগে জড়িত ছিলেন। 'মোহাম্মদী'র কাজের পাশাপাশি তিনি 'আজাদ'-এর সম্পাদনা বিভাগেও কাজ করতে লাগলেন।

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'আজাদ'-এর আত্মপ্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মওলানা আকরম খাঁ উপমহাদেশের রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে ও মুসলিম নবজাগরণের পটভূমিতে 'আজাদ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশের পর প্রথম কয়েক বছর সম্পাদক হিসাবে মওলানা সাহেব নিজেই পত্রিকা দেখাশোনা করতেন। পত্রিকার জন্য সেসময় তিনি অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং কলামও লিখেছেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে তিনি বেশীদিন 'আজাদ'-এর সম্পাদনা এবং বিভিন্ন দিকে কাজ দেখাশুনা করতে পারেননি। দু'তিন বছর পর তিনি অসুস্থ হলে মধুপুর চলে যান। তখন আজাদ-এর সিনিয়র সাংবাদিক নজির আহমদ চৌধুরী ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনই পত্রিকার সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করতেন। মওলানা সাহেব অসুস্থ অবস্থায় স্থির করলেন তিনি আর আজাদ -এর সম্পাদক থাকবেন না। তিনি তাঁর বড় ছেলেকে মধুপুর থেকে লিখে জানালেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সম্পাদক করে পত্রিকার নতুন ডিক্লারেশন নিতে। সিনিয়র হিসেবে নজির আহমদ চৌধুরীকেই সম্পাদক নির্বাচন করা সংগত ছিল। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং আরও অনেকে তাই আশাও করেছিলেন। কিন্তু মওলানা সাহেবের ইচ্ছে ভিন্ন। তিনি চেয়েছেন আবুল কালাম শামসুদ্দীনই 'আজাদ'-এর সম্পাদক হবেন। মওলানা সাহেবের ইচ্ছেই বাস্তবায়িত হল।

এভাবেই আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন। মওলানা আকরম খাঁ নিজেও একজন পণ্ডিত, আলেম, সমাজ সংস্কারক, অগ্রণী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। সেকালে আকরম খাঁ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্য সংস্কৃতি-চিন্তা, জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্যবোধের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মত-পার্থক্য ছিল। তবু মওলানা সাহেব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বকেই সম্পাদক পদে নির্বাচন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আকরম খাঁর এই সিদ্ধান্ত দূরদর্শী সিদ্ধান্ত হিসেবেই প্রশংসিত হয়েছিল। 'আজাদ'-এর সম্পাদক হিসাবে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভূমিকা ও অবদান মওলানার সিদ্ধান্তের যথার্থতাই প্রমাণিত করেছে।

১৯৪০ সালে আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'আজাদ'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এভাবেই শুরু হল তাঁর 'আজাদ যুগ'। চল্লিশ ও পঞ্চাশের

দশকে রাজনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি ও মুসলিম নবজাগরণের ক্ষেত্রে 'দৈনিক আজাদ' এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। আর তারই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

সওগাত, দৈনিক মোহাম্মদী, সেবক, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকা ছাড়াও 'আজাদ' পত্রিকার শুরু থেকেই আবুল কালাম শামসুদ্দীন নানা ধরনের লেখা লিখেছেন। এর মধ্যে অনুবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, ব্যঙ্গ রসাত্মক কলাম উল্লেখযোগ্য। 'আজাদ'-এর পাঠকরা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের লেখার সংগে, চিন্তাধারার সংগে পরিচিত ছিলেন। তাই মওলানা সাহেব যখন তাঁকে সম্পাদক মনোনীত করলেন তখন তা বিভিন্ন মহলে অভিনন্দিত হয়। বিভিন্নস্থানে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেরকম একটি সংবর্ধনা সভায় হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর ভাষণে বলেন: "বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তন হইয়াছে যে কজন সাহিত্যিকের সাধনায়, আবুল কালাম তাঁহাদের একজন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যদিয়ে অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, প্রজা আন্দোলন, মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলন, লীগ আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন তিনি। আবুল কালামের সম্বর্ধনায় তারুণ্যের জয়যাত্রাই সূচিত হইতেছে"। (দৈনিক আজাদ, চতুর্থ বর্ষ ১৩১ সংখ্যা, ৯ই এপ্রিল ১৯৪০)।

১৯৪২ সালে কলকাতার 'আজাদ' অফিসে জন্ম নেয় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই প্রতিষ্ঠান গড়ার পেছনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 'আজাদ' অফিসকে ঘিরে আবর্তিত হল রেনেসাঁ সোসাইটির কর্মতৎপরতা। 'আজাদ'-এর সহকারী সম্পাদক মুজীবুর রহমান খাঁ ছিলেন সোসাইটির আহ্বায়ক। 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী'র সংগে সংশ্লিষ্ট লেখকরা এই প্রতিষ্ঠানের সংগে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। 'আজাদ' অফিসে প্রতি সপ্তাহে বসতো রেনেসাঁ সোসাইটির বৈঠক। বিভিন্ন লেখক রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রবন্ধ পড়তেন। তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হতো। 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় ছাপা হতো এসব বৈঠকের বিবরণ। ফলে মফস্বলের তরুণরাও এসব আলোচনার স্বাদ পেতেন। 'আজাদ' পত্রিকা অফিসে যে রেনেসাঁ সোসাইটির তৎপরতা সৃষ্টি হয় তা এক তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য আন্দোলনে রূপ নেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে এই সাহিত্য আন্দোলন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

'দৈনিক আজাদ' ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখপত্র। মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা আরো স্পষ্টভাবে মুসলিম লীগের রাজনীতির বাহক হয়ে উঠলো 'আজাদ'। তখন উপমহাদেশে চলছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি। একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে মুসলিম লীগ। আবার একদিকে ভারতীয় জাতীয়তা অপরদিকে মুসলিম জাতীয়তা। একদা কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয়তার বাণীবাহক হলেও এই সময়-সন্ধিক্ষণে মওলানা আকরম খাঁ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, ভারত উপমহাদেশ এক জাতির দেশ নয়, এটা বহু জাতির দেশ। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখন 'আজাদ'-এর পাতায় নানা উদ্দীপক প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। আর সামগ্রিকভাবে 'আজাদ'-এর ভূমিকাতো ছিলই। যাই হোক, এক দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৬-এর নির্বাচনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মেনে নেয়।

এভাবেই মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি 'পাকিস্তান' কায়েম হল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষ করে পশ্চিম বংগ থেকে অনেক মুসলমান পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যান। ব্যক্তি বা পরিবার ছাড়াও বহু সম্পত্তিও হস্তান্তরিত হয়। 'আজাদ' পত্রিকা ঢাকায় স্থানান্তর হয় দেশ ভাগের এক বছর পরে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এক বছর পর্যন্ত 'আজাদ' কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এক বছরের মধ্যেই প্রথম বিক্ষোভ প্রকাশ পায় ভাষা প্রসংগে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে যে আন্দোলন শুরু হয় তার সমর্থনে এগিয়ে আসে 'আজাদ'। জিন্না ও নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৪৮ সালে এই আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে কলকাতা থাকাকালেই আবুল কালাম শামসুদ্দীন এক যুক্তিনিষ্ঠ সম্পাদকীয় রচনার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলার জন্য সারা দেশে যে আন্দোলন হয় তাতে 'আজাদ' ও সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন চূড়ান্তরূপ লাভ করে। ঐদিন ছাত্র জনতার মিছিলের উপর নুরুল আমিন সরকারের

পুলিশ গুলি চালালে আবুল বরকত নামে একজন ছাত্র শহীদ হন। ঢাকা নগরী এই ঘটনায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখন প্রাদেশিক পরিষদে সরকার দলীয় (মুসলিম লীগ) সদস্য। নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে তিনি পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের কাছে পাঠানো তাঁর পদত্যাগপত্রে লেখা হয়েছিল :

> "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।"

এই একটি ঘটনা আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁর এই মাতৃভাষা-প্রীতি, দায়িত্ববোধ, মানবিকতা, গণমানুষের প্রতি ভালবাসা ও সর্বোপরি নির্ভীকতা সাধারণের কাছে তাঁর ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে।

ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় শোকসভায় আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। একই দিনে তিনি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। (পুলিশ অবশ্য সেই মিনারটি পরে ভেংগে দিয়েছিল)।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সংগে 'আজাদ' পত্রিকা ও সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের নাম অমর হয়ে আছে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন। আর সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে মালিকের সংগে এই নীতিগত বিরোধের ফলেই তিনি ১৯৬২ সালে 'আজাদ' পত্রিকার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৬২ সাল একটানা ২৩ বছর তিনি 'আজাদ'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এত দীর্ঘ সময় সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের ইতিহাস আমাদের দেশে আর নেই। আর সেজন্যেই সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন জীবিতকালেই সাংবাদিক হিসেবে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে সময় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন সে সময় এত পত্রিকা, এত সম্পাদক

ও এত সাংবাদিকের ছড়াছড়ি ছিলনা। দৈনিক 'আজাদ' সম্পাদনাকালে সাংবাদিক-সৃষ্টিতেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন বিশেষ অবদান রাখেন। সেকাল ও একালের অনেক খ্যাতনামা সাংবাদিকেরই হাতে খড়ি হয় তাঁর হাতে।

'আজাদ' ছাড়ার প্রায় কয়েক মাস পরে তিনি 'জেহাদ' নামে একটি দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। দেড় বছর চলার পর 'জেহাদ' বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কিছু কিছু গ্রন্থ অনুবাদের কাজ করেন। তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরুতেও তিনি কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তুর্গেনভের 'ভার্জিন সয়েল'-এর অনুবাদ 'পোড়ো জমি' (পরিবর্তিত নাম 'অনাবাদী জমি)' তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের মর্যাদা দেয়। এই কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলা যায়। চাকরীহীন থাকার এই সময়ে তিনি বাংলা একাডেমীর পক্ষে হোমারের 'ইলিয়ড' গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। এ পর্যন্ত এ গ্রন্থের এটিই একমাত্র বাংলা অনুবাদ। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে আবুল কালাম শামসুদ্দীন অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০) লাভ করেন।

১৯৬৪ সালে 'প্রেস ট্রাষ্ট অব পাকিস্তান' ঢাকা থেকে একটি বাংলা দৈনিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। পত্রিকার নাম 'দৈনিক পাকিস্তান'। ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে এই নতুন বাংলা দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে মাস থেকেই 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর প্রকাশনা শুরু হয়। (স্বাধীনতার পরে পত্রিকাটি 'দৈনিক বাংলা' নামে প্রকাশিত হচ্ছে)।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখন সম্পাদক হিসেবে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ধারণ করে সরকারী অর্থে প্রকাশিত ট্রাষ্টের পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান' তখন পাঠক মহলে নন্দিত হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্র প্রকাশনায় 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর আত্মপ্রকাশ একটি বিশেষ ঘটনা। এই পত্রিকা শুধু সাংবাদিকতায় তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেনি; দৈনিক পাকিস্তানে সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন এদেশের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ফজল শাহা-

বুদ্দীন। এছাড়া সানাউল্লাহ নূরী, মোজাম্মেল হক, তোয়াব খান, নির্মল সেন, আহমেদ হুমায়ূন-এর মতো দক্ষ সাংবাদিকরাও এই কাগজে যোগ দেন। খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক-এর এক শক্তিশালী দল এই পত্রিকাকে একটি আধুনিক বাংলা দৈনিকে পরিণত করেন। এঁদের নেতৃত্ব দেন আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো কিংবদন্তী সম সম্পাদক। দৈনিক পাকিস্তান-এর ভাষা, রিপোর্ট, রিপোর্টার্জ, ফিচার, উপ-সম্পাদকীয়, ব্যক্তিগত কলাম সব মিলিয়ে, এক অনবদ্য বাংলা দৈনিক হয়ে উঠেছিল, যা ঐ সময় ছিল নতুন, টাটকা ও আধুনিক। বাংলা পত্রিকায় ফিচার ষ্টোরি চালু করার পেছনে দৈনিক পাকিস্তান-এর কৃতিত্ব প্রায় একক বলা যায়। দৈনিক পাকিস্তান আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। তা হল, সরকারের ট্রাষ্টের কাগজ হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক পাকিস্তান বিভিন্ন সময় প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে, যা অনেক বিরোধী কাগজও করেনি। যেমন: আইয়ুব আমলে রবীন্দ্রনাথ বর্জন প্রশ্নে, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার প্রশ্নে দৈনিক পাকিস্তান সরকার বিরোধী মতামতই বরাবর তুলে ধরেছে। এসব ভূমিকা সম্ভব হয়েছিল আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো নির্ভীক সম্পাদক মাথার উপরে ছিলেন বলেই। দৈনিক পাকিস্তান অফিস পরোক্ষভাবে ঢাকার একটি প্রগতিশীল সাহিত্যিক আড্ডায় পরিণত হয়েছিল।

১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এবং ১৯৭২ সনের প্রথম দিকে 'দৈনিক বাংলা' থেকে তাঁকে অবসর দেয়া হয়।

তারপর আর কোন চাকরী তিনি করেননি। সত্যিকারের অবসর জীবনই কাটিয়েছেন।

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবুল কালাম শামসুদ্দীন গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্যে তাঁকে পি, জি, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের আবেদনে তাঁর চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি আর সুস্থ হলেন না। ১৯৭৮ সালের ৪ঠা মার্চ পি, জি, হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৫ই মার্চ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর প্রধান অতিথি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সম্মেলন কক্ষ শোকসভায় পরিণত হয়। শোক ও শ্রদ্ধার নিদর্শণস্বরূপ সম্মেলন মঞ্চে প্রধান অতিথির আসন শূন্য ও কালো কাপড়ে আবৃত রাখা হয়।

প্রায় চার দশক ধরে সাংবাদিকতার বিকাশ ও উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার পর উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এভাবে বিদায় নিলেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের আরেক পরিচয়—তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর দক্ষতা সুবিদিত। সাংবাদিকতা পেশায় না আসলেও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। তাঁর সাহিত্য কীর্তি সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন :

> "পেশায় সাংবাদিক ছিলেন বটে—সে সংগে তাঁর মধ্যে সাহিত্যিক আর সাহিত্য রসজ্ঞেরও সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর আত্মজীবনী আর অনুবাদ গ্রন্থে আমরা সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে খুঁজে পাই—তাঁর রসজ্ঞানের পরিচয় মেলে তাঁর সমালোচনা আর সাহিত্যে বিচারমূলক রচনায়। সে রচনার সংখ্যাও কম নয়।"

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্য চর্চার প্রধান আশ্রয় ছিল 'সওগাত'। সওগাত' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সে যুগে যে কজন মুসলমান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁদের অন্যতম। এ প্রসংগে 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "সওগাত পরিচালনা করতে গিয়ে সুদীর্ঘ জীবনে আমাদের সমাজে বহু প্রতিভার আবিস্কার করতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রতিভা।"

"সওগাত' পত্রিকার পাতায় আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা ছড়িয়ে আছে। অল্প বয়সেই তিনি মননশীল প্রবন্ধ লিখে পাঠকদের মনোযোগ লাভ করেছিলেন। কবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মান কাব্য' সম্পর্কে তাঁর লেখা একটা দীর্ঘ আলোচনা প্রথমে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ' 'কাব্য সাহিত্যে বাংগালী মুসলমান' যা 'সওগাত'-এ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধেই তিনি কবি নজরুল ইসলামকে 'যুগপ্রবর্তক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তখন কবি নজরুল এর বিশেষ কোন খ্যাতি হয়নি। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শীতার সংগে কবি নজরুলকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। 'সওগাতে' এক সময় তিনি কাজও করেছেন। তখন কবি নজরুল তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

'সওগাত' ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধাবলী 'বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'প্রতিভা', 'বুলবুল' 'নবশক্তি' ও 'অভিযান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর

সুদীর্ঘকালের সাহিত্যিক সাংবাদিক জীবনে লেখা বহু রচনা উভয় বাংলার অনেক পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে : (১) কচিপাতা, শিশু পাঠ্য গল্প সংকলন (১৯৩৩)। (২) অনাবাদী জমি, তুর্গেনিভের উপন্যাস 'ভার্জিন সয়েল'-এর অনুবাদ (১৯৩৮)। (৩) ত্রিস্রোতা, তুর্গেনিভের তিনটি গল্পের রূপান্তর (১৯৩৯)। (৪) খরতাংগ : উপন্যাস (১৯৫৩-৫৪)। (৫) দৃষ্টিকোণ : প্রবন্ধ সংকলন (১৯৬১)। (৬) পলাশী থেকে পাকিস্তান : ইতিহাস। (৭) আমির তৈমুর : তৈমুর লঙ-এর জীবনী। (৮) নতুন চীন নতুন দেশ : ভ্রমণ কাহিনী (১৯৬৫)। (৯) অতীত দিনের স্মৃতি : আত্মজীবনী (১৯৬৮)। (১০) ইলিয়ড : অনুবাদ। এছাড়াও তিনি স্কুল পাঠ্য বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা, সম্পাদনা ও সংকলন করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ, ১৯৮৩।
২. আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্মরণিকা। মার্চ, ১৯৮১।
৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্মারক গ্রন্থ, মার্চ, ১৯৭৯।

আবুল মনসুর আহমদ

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) সাংবাদিকতায় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ। শুধু সাংবাদিকতায় নয়, সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও আবুল মনসুর আহমদের স্থান প্রথম সারিতে। রাজনীতি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা—আবুল মনসুর আহমদের ব্যক্তিত্বে এই ত্রিধারার সম্মিলন ঘটেছে। এর যে কোন একটি দিক নিয়েই আলাদাভাবে আবুল মনসুর আহমদের পরিচয় দেয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আবুল মনসুর আহমদকে জানতে হলে তাঁর এই ত্রিধারা সম্পর্কেই জানতে হবে।

অনেকে সাংবাদিকতা করার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য চর্চা করেন। অনেকে রাজনীতির সংগেও যুক্ত থাকেন। তবে প্রধান পেশা থাকে সাংবাদিকতা। আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য বা রাজনীতিকে সে রকম সৌখিনভাবে নেননি।

সাংবাদিকতায় চল্লিশের দশকে তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যমণি। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকায় কাজ করেছেন এবং তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক 'ইত্তেহাদ' সেকালে একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে পরিণত হয়েছিল। ব্যংগ প্রধান সাহিত্য রচনায় আবুল মনসুর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স' বই দুটি বৈশিষ্টব্যঞ্জক সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তিনি একজন প্রথম সারির রাজনীতিবিদ ছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রদেশে ও কেন্দ্রে মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন।

এতে বোঝা যায়, আবুল মনসুর আহমদ যখন যা করেছেন তা খুবই নিষ্ঠা নিয়ে করেছেন এবং সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও রাজনীতিতে তাঁর যোগ্যতাও প্রমাণিত হয়। এত বিচিত্রমুখী প্রতিভা নিয়ে আমাদের দেশে খুব বেশী ব্যক্তিত্ব জন্ম নেননি।

আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর (১৩০৫ সনের ১৯শে ভাদ্র) ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল পুঁথি সাহিত্যের। তাই পারিবারিক পরিবেশে পুঁথি সাহিত্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। পুঁথি থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য চিন্তার স্ফুরণ ঘটে। লেখালেখির দিকে তাঁর আগ্রহও এভাবে সৃষ্টি হয়।

তাঁর প্রাইমারী শিক্ষা হয় বাড়ীতে ও গ্রামের পাঠশালায়। নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা হয় ত্রিশাল-দরিরামপুরে। মাধ্যমিক শিক্ষা হয় ময়মনসিংহ শহরে।

তখন বৃটিশের যুগ। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নানা বিরোধ লেগেই থাকতো। হিন্দুরা লেখাপড়া, চাকরীবাকরী সংস্কৃতি সব দিকেই মুসলমানদের চেয়ে অগ্রণী। আবুল মনসুর যে স্কুলে ভর্তি হলেন সেটাও হিন্দু প্রধান স্কুল। তখন হিন্দু প্রধান স্কুলে মুসলমানরা বিশেষ সুবিধা করতে পারতো না। ঐ স্কুলে হিন্দু মুসলমানদের বসার জন্যে পৃথক বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল।

তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'আলইসলাম' পত্রিকায়। লেখাটি ছিলো স্পেনে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের মৌলিক নিদর্শনের ওপর। লেখাটি অবশ্য মৌলিক ছিলনা। একটি বিদেশী গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। স্কুল জীবনের শেষ দিকে ও কলেজ জীবনে এরকম নানা জটিল বিষয়ে তিনি অনুবাদ ও প্রবন্ধ লেখেন। এসময় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা শিক্ষকদের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯১৭ সনে আবুল মনসুর ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা শহরে আসেন। তিনি জগন্নাথ কলেজ-এ আই, এ, ক্লাশে ভর্তি হন। তখন তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার বৃত্তি, জায়গীরের টাকা ইত্যাদি নিয়ে ঢাকায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল।

আই, এ পড়ার সময় আবুল মনসুর গল্প লিখতে শুরু করেন মাসিক 'সওগাত'-এ। ১৯১৮-১৯২০ সালের মধ্যে সওগাত-এ পাঁচ ছয়টি গল্প লিখেই তিনি শক্তিশালী তরুণ গল্পকার হিসেবে পাঠক মহলে স্বীকৃতি

লাভ করেন। 'সওগাত'-এর মাধ্যমে তিনি নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতে থাকেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের সেরা লেখাগুলো 'সওগাত'-এর পাতাতেই প্রকাশিত হয়।

জগন্নাথ কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করার পর আবুল মনসুর ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। সেখানে তিনি দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি, এ, ক্লাশে ভর্তি হন। ছাত্র জীবনে দর্শনে অনার্স নিলেও তাঁর প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস। শুধু 'পাঠ্য বইয়ের' দিকে নিবদ্ধ না থেকে এসময় কলেজ লাইব্রেরীতে নানা ধরনের বইপত্র পড়ে তিনি শেষ করেন। এ সময় বি, এ, পরীক্ষার কয়েকমাস আগে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়াতে তিনি কলেজ ছেড়ে দিলেন। পরে কলেজের অধ্যক্ষ ল্যাংলী সাহেবের বিশেষ অনুরোধে অনার্স পরীক্ষা দিলেন বটে, কিন্তু অনার্স ডিগ্রী পেলেন না, পেলেন বি, এ, পাস ডিগ্রী।

তখন সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে ইংরেজদের সংগে সহযোগিতা করা হবে এই ধারণায় আবুল মনসুর অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হননি। ১৯২৬ সনে কলকাতার রিপন কলেজে তিনি ভর্তি হন এবং ১৯২৯ সনে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে ফাইন্যাল পাশ করেন।

ছাত্র জীবনে প্রত্যেক মানুষের যেরকম স্বপ্ন থাকে সেরকম আবুল মনসুর আহমদেরও স্বপ্ন ছিল সাহিত্যিক হওয়ার। সাংবাদিক হওয়ার কথা তাঁর কখনো মনে হয়নি। তিনি লেখায় ও পড়ায় নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন সাহিত্যিক হবার জন্য। কিন্তু শিক্ষা জীবন শেষে রোজগারের প্রশ্ন উঠল। শুরু হলো চাকুরী অন্বেষণ।

ছাত্র জীবনেই তিনি সাংবাদিকতার সংগে জড়িয়ে পড়েন। সাহিত্য চর্চা তো ছিলই। সেই অর্থে আবুল মনসুরের সাংবাদিক জীবন শুরু হয় ১৯২৩ সালে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখন 'মুসলিম জগৎ' নামের সাপ্তাহিক-এর সম্পাদক। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের উৎসাহে আবুল মনসুর 'মুসলিম জগৎ' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা তখন মুসলিম সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুটা লেখার কারণে কিছুটা শামসুদ্দীন সাহেবের চেষ্টায় আবুল মনসুরের চাকরী হয় 'ছোলতান' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে। 'ছোলতান'-এর মালিক ছিলেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। 'ছোলতান্'-এ তিনি দেড় বছর চাকরী করেন। 'ছোলতান'-এ কাজ করার সময়

তিনি মওলানা আকরম খাঁ'র দৃষ্টিতে পড়েন। আকরম খাঁ সাহেব মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে বলে আবুল মনসুরকে নিয়ে আসেন তাঁর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার জন্য। বেতন ধার্য হয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা। মোহাম্মদীতে আবুল মনসুরের সহকর্মী ছিলেন ফযলুল হক সেলবর্ষি ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় তেজস্বি ও যুক্তিপূর্ণ বহু সম্পাদকীয় লিখে আবুল মনসুর সাংবাদিক মহলে তখন বেশ নাম করেন। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীতে' থাকার সময় আবুল মনসুরকে পত্রিকার অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। পত্রিকার জন্য নতুন কপি লেখা, বিভিন্ন দৈনিক থেকে বাছাই করা খবর সংকলন, ডাকযোগে আসা প্রবন্ধ, খবর, চিঠিপত্র ঠিকমতো সম্পাদনা করা ও সম্পাদকীয় লেখা তো আছেই। এমনকি তাঁকে প্রুফ রিডিংও করতে হয়েছে। এসব কাজ তিনি খুব আগ্রহ সহকারেই করেছেন। তাঁর উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বলে তিনি কখনো মনে করেননি। এ প্রসংগে 'আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছেন :

"আমার পরবর্তী সাংবাদিক জীবনে জুনিয়র স্তরের এই খাটুনি খুবই কাজে লাগিয়াছিল।"

'ছোলতান' পত্রিকায় আলী আহমদ ওলী আর 'মোহাম্মদী'তে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর কাছে তিনি সাংবাদিকতা পেশার নানা খুঁটিনাটি জ্ঞান লাভ করেন।

একটা ঘটনা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হলে মওলানা আকরম খাঁ আবুল মনসুরের চাকরী খারিজ করে দেন। আবুল মনসুর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে দেড় বছর চাকুরী করেন। এ ঘটনার পরপরই আবুল মনসুর চাকুরী পেলেন মৌলভী মুজিবর রহমানের 'দি মুসলমান'-এ। বেতন স্থির হল পঁয়ষট্টি টাকা। 'দি মুসলমান' তখন মুসলিম সমাজের কণ্ঠস্বর হিসেবে পাঠক মহলে নন্দিত। আবুল মনসুর মৌলভী মুজিবর রহমানের বিশেষ স্নেহ লাভ করলেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'দি মুসলমান'-এ কাজ করতে লাগলেন। 'দি মুসলমান'-এ তিনি সাব-এডিটরের সাধারণ কাজ ছাড়াও প্রথমে এডিটোরিয়াল নোট ও পরে পুরো এডিটোরিয়াল লিখতেন। লিখতে লিখতে আবুল মনসুর এত সিদ্ধহস্ত হলেন যে, পরে মুজিবর রহমান আর লেখা দেখে দিতেন না, সরাসরি প্রেসে পাঠিয়ে দিতেন।

আবুল মনসুর আহমদ যে ইংরেজী ভাষাতেও কত দক্ষ ছিলেন 'দি মুসলমান'-এর লেখাগুলো তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু তাঁর সত্যিকার

দক্ষতা ছিল বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় আবুল মনসুর এর এই দক্ষতার কথা মৌলভী মুজিবর রহমানও অবহিত ছিলেন। অনেকটা আবুল মনসুর আহমদের ক্ষমতা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তিনি 'খাদেম' নামে একটা বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন। এবং তা সম্পাদনা, পরিচালনার যাবতীয় ভার আবুল মনসুরের উপর ন্যস্ত করলেন।

সাংবাদিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি আইন পড়াশুনাও চালিয়ে যান এবং ওকালতি পাশ করেন। 'খাদেম'-এ চাকরী করার সময় তাঁর বেতন দাঁড়ায় পঁচাশি টাকা। কিন্তু ঐ টাকাতে আবুল মনসুরের পক্ষে সংসারের ব্যয় নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি স্থির করলেন কলকাতা ছেড়ে ময়মনসিংহ গিয়ে ওকালতি করবেন। আবুল মনসুরের এই পরিকল্পনার কথা শুনে মৌলভী মুজিবর রহমান হতাশ হলেন বটে কিন্তু তাঁকে যেতে বাধা দিলেন না।

এভাবেই ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিক জীবনের প্রথম পর্যায় শেষ হলো।

সাংবাদিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। ঐ সময় নিখিল বংগ কৃষক প্রজা সমিতির উদ্যোগে কৃষক প্রজা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'দৈনিক কৃষক' প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করে একটি লিমিটেড কোম্পানী রেজিষ্ট্রি করা হয়। আবুল মনসুর আহমদকে প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন 'কৃষক'-এর একজন পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেসের রাজনীতিতে অভ্যন্তরীণ বিরোধে গান্ধী-সুভাষ বসু দ্বন্দ্বে 'কৃষক' সমর্থন দিচ্ছিল সুভাষ বসুকে। এভাবে কাগজ কিছুদিন জনপ্রিয় হল বটে কিন্তু একদিন অর্থাভাব গ্রাস করলো 'কৃষক'কে। এমনই অর্থাভাব যে কাগজের অস্তিত্বের উপরই টান পড়লো। 'কৃষক'-এর পরিচালনা পরিষদে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পত্রিকার ব্যবসা ততটা ভাল বুঝতেন না। অগত্যা আবুল মনসুরকে পত্রিকাকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করার জন্য কাগজের ব্যবসা বাণিজ্য দেখার জন্য যোগ দিতে হল। এতদিন তিনি শুধু সম্পাদনা ও লেখালেখির কাজেই জড়িত ছিলেন। 'কৃষক'-এর এই দুরবস্থায় হাল ধরতে তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি সংবাদ শিল্প ও সংবাদ বাণিজ্য বিষয়েও অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেলনা। অগত্যা হেমেন্দ্র নাথ দত্ত নামে কলকাতার একজন ধনী ব্যক্তিকে ম্যানেজিং

ডাইরেক্টর করে 'কৃষক'-এর পরিচালনা পরিষদ আবার পুনর্বিন্যাস করা হল। মিঃ দত্ত দায়িত্ব নেবার পর 'কৃষক' আবার বেঁচে উঠল। কিন্তু বিরোধ বাধল নীতি নিয়ে। ঐ সময় ফজলুল হক মন্ত্রী সভার প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে সম্পাদক আবুল মনসুরের সংগে মিঃ দত্তের বিরোধ বাঁধে। 'কৃষক'-এর সম্পাদকীয়তে আবুল মনসুর এই বিলের সমর্থন করেন আর নীতিগতভাবে মিঃ দত্ত এই বিলের বিরোধী। বিরোধ একেবারে চরম আকার ধারণ করলো। তখন 'কৃষক'কে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে আবুল মনসুর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানেও আবুল মনসুরের নীতিজ্ঞান কাজ করেছে। কারণ এর আগে এক বিতর্কে তিনি 'কৃষক'-এ লিখেছেন :

> সংবাদপত্র সম্পাদকের মতে নয়, মালিকের মতে চলবে। তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন, "সাংবাদিকতা ওকালতির মতই একটা প্রফেশন। এটা মিশনারির মত আদর্শ সেবা নয়। উকিল যেমন দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে সকলের কেস নেন, সাংবাদিকও তেমনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু সভা নির্বিশেষে সকলের কেস নেবেন। অর্থাৎ যিনি তাঁর ফিস দেবেন তাঁরই পক্ষে সাংবাদিক কলম ধরবেন। এটা তাঁর ব্যবসায়িক কাজ।" (আত্মকথা, পৃঃ ৩৫৩)।

আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিক জীবনে তৃতীয় পর্যায় : 'নবযুগ'। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এ, কে, ফজলুল হক 'নবযুগ' বের করেন। আবুল মনসুরকে সম্পাদনার ভার দেয়া হয়। কিন্তু আবুল মনসুর সম্পাদক হিসেবে পত্রিকায় নাম ছাপাতে রাজী হলেন না। তিনি প্রস্তাব দিলেন ফজলুল হকের নামই সম্পাদক হিসেবে ছাপা হোক। ফজলুল হক তখন প্রধান মন্ত্রী। কাজেই স্বরাষ্ট্র বিভাগ এমনকি লাট সাহেবও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। অবশেষে আলাপ আলোচনা করে স্থির করা হল সম্পাদক হিসেবে কবি নজরুলের নাম ছাপা হবে। কবি নজরুল তখন রীতিমতো বিখ্যাত এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী কবিতা লিখে "বিদ্রোহী কবি" নামে জনপ্রিয়। কবি নজরুল ঐ সময় দায়দেনায় বিপন্ন ছিলেন। তাই 'নবযুগের' এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। নজরুল ইসলামের সংগে চুক্তি হল, বিশেষ কিছু তাঁকে করতে হবেনা, মাঝে মাঝে বিকেল বেলা অফিসে আড্ডা এবং সপ্তাহে এক আধটা কবিতা দিলেই যথেষ্ট।

'নবযুগ'-এ আবুল মনসুর হক সাহেবের রাজনীতির পক্ষে জোরালো ভাষায় লিখে যেতে লাগলেন। এভাবে লিখতে লিখতে তিনি হক সাহেবের

রাজনীতির সংগেও জড়িয়ে পড়লেন। 'নবযুগ'-এর মাধ্যমে আবুল মনসুর রাজনৈতিক সাংবাদিকতায় দক্ষ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু 'নবযুগেও' আবুল মনসুর বেশীদিন থাকতে পারলেন না। কারণ এখানেও সেই হেমেন্দ্র নাথ দত্ত এসে হাজির। তিনি নাকি হক সাহেবের সংগে আলাপ করে, 'নবযুগ'-এর পরিচালনার ভার নিচ্ছেন। হক সাহেবের এই সিদ্ধান্ত আবুল মনসুর সহজে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি মিঃ দত্তকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেন নি। বরং অফিসে তাঁর সংগে দুর্ব্যবহার করে 'নবযুগ'-এর সংগে সম্পর্ক ইতি ঘটান। মিঃ দত্ত অবশ্য পুরোনো ঘটনা ভুলে গিয়ে আবুল মনসুরের সংগে মিলেমিশে 'নবযুগ'-এর কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবুল মনসুর 'কৃষক'-এর ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। তাই মিঃ দত্তের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার চাইতে 'নবযুগ'-এর চাকুরী ছেড়ে দেয়াই তিনি উত্তম মনে করলেন।

আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিক জীবনের চতুর্থ ও শেষ পর্যায় শুরু হয় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আবুল মনসুর আহমদকে সম্পাদক করে একটি বাংলা দৈনিক বের করার জন্য আগ্রহী হন। আবুল মনসুর তখন কলকাতার আলীপুরে ওকালতি করেন। একটি লিমিটেড কোম্পানী করে অত্যন্ত ধুমধামের সংগে নতুন দৈনিক আত্মপ্রকাশ করল। পত্রিকার নাম 'ইত্তেহাদ'। অল্পদিনের মধ্যে 'ইত্তেহাদ' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রচার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। একটি কাগজ পাঠকপ্রিয় হবার পেছনে যতগুলো শর্ত থাকা দরকার 'ইত্তেহাদ' প্রায় সবগুলো শর্তই পূরণ করেছিল। 'ইত্তেহাদ'-এর আগে মুসলিম পরিচালিত কোন বাংলা দৈনিক এত বৈশিষ্টমণ্ডিত হয়ে বেরোয়নি। সাহিত্য পাতা, মহিলা পাতা, ছোটদের পাতা, সিনেমা পাতা, নগর পরিক্রমা, খেলাধূলা ইত্যাদি নানা ফিচারে 'ইত্তেহাদ' হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। আবুল মনসুর আহমদ পঁচিশ বছর ধরে নানা ধরনের সংবাদপত্রে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার সবকিছু দিয়ে তিনি 'ইত্তেহাদ'কে একটি প্রথম শ্রেণীর আধুনিক পত্রিকা হিসেবে গড়ে তোলেন। একটি আধুনিক সংবাদপত্রে সম্পাদকের প্রকৃত যে দায়িত্ব থাকে তিনি 'ইত্তেহাদ'-এ সেই দায়িত্বই পালন করার চেষ্টা করেছেন। 'ইত্তেহাদ' তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'ইত্তেহাদ'-এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত মুসলিম যুব শ্রেণীকে সাংবাদিকতা পেশায় অনুপ্রাণিত করেন। তিনি বহু প্রতিভাবান মুসলিম যুবককে

'ইত্তেহাদ'-এর নানা দায়িত্বে নিয়োগ করছিলেন যাঁরা বাংলা সাংবাদিকতায় পরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বাংলাদেশে খ্যাতনামা অনেক সাংবাদিকই 'ইত্তেহাদ'-এ আবুল মনসুর আহমদের তত্ত্বাবধানে কাজ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, খোন্দকার ইলিয়াস, কে, জি, মোস্তফা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, আহসান হাবীব, মোহাম্মদ নাসির আলী, রোকনুজ্জামান খান, খোন্দকার আবদুল হামিদ প্রমুখ।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট দেশ ভাগ হয়। অন্যান্য পত্রিকার মতো 'ইত্তেহাদ'ও ঢাকা থেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হল। পূর্ব পাকিস্তানে তখন খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভা। তাঁরা সোহ্‌রাওয়ার্দীর পত্রিকাকে বিশেষ সুনজরে দেখলেন না। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা 'ইত্তেহাদ'-এর পূর্ব বাংলা প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। ঢাকায় 'ইত্তেহাদ'-এর জন্যে বাড়ী পর্যন্ত ভাড়া নেয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সরকারী সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এভাবে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে 'ইত্তেহাদ'-এর অপমৃত্যু ঘটে।

'ইত্তেহাদ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে আবুল মনসুর আহমদের সক্রিয় সাংবাদিক জীবনের ইতি ঘটল। এরপর প্রধানতঃ তিনি ওকালতি ও রাজনীতি নিয়েই বেশী সময় কাটিয়েছেন। আর সাহিত্য চর্চা তো ছিলই। তবে সাংবাদিকতার সংগে তিনি একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন না। ঢাকার দু'একটি পত্রিকায় তিনি তখন নিয়মিত কলাম লেখা শুরু করেন। ক্রমে তিনি বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় একজন বিশিষ্ট 'কলামিষ্ট' হিসেবে সমাদৃত হন। কলাম লেখায় যখন তিনি ভালভাবে মন দেন তখন তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। ফলে তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দেশ ও সমাজের নানা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কলাম লিখে গেলেন। অবশ্য জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে আর বিশেষ লেখালেখি করতে পারেন নি। শরীর এতই ভেংগে পড়েছিল যে, পূর্ণ অবসর নেয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় ছিল না।

আবুল মনসুর আহমদের আরেক পরিচয় তিনি রাজনীতিক ছিলেন। নেহাৎ একজন রাজনৈতিক কর্মী নন, উঁচুদরের নেতা ছিলেন। শুধু নেতা বললে কম বলা হবে, তিনি ছিলেন রাজনৈতিক অংগনে চিন্তানায়ক। আওয়ামী লীগ-এর প্রতিষ্ঠায়, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রণ্ট নির্বাচনে ও ২১ দফা প্রণয়নে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীত্ব করেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতেও বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কিছুদিন (১৯৫৬) পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করেছেন। পাকিস্তান আমলে প্রথম সামরিক আইন জারীর পর তিনি পর পর দুবার কারাবরণ করেন। পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এন. ডি. এফ. (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট) গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর এন. ডি. এফ. ভেংগে যায় শুরু হয় দলীয় রাজনীতির উত্থান। আবুল মনসুর তখন আর দলীয় রাজনীতিতে জড়াতে চাননি। আস্তে আস্তে তিনি নিজেকে দলীয় রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নেন। পরবর্তীকালে তিনি দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নানা সংকটে বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন। তিনি একজন রাজনৈতিক অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর সেই সংগে সংবাদপত্রে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যু নিয়ে কলাম লিখেছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে।

তাঁর সাংবাদিক সত্তাটি সবচে প্রখর হলেও জীবনব্যাপী তিনি রাজনীতির সংগেই জড়িয়ে ছিলেন। "শৈশবে প্রজা আন্দোলন, তারপর স্বদেশী আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী স্বাধীকার আন্দোলন এ দেশে অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তাবৎ রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কখনো সক্রিয় কর্মীর, কখনো নেতার, কখনো পরামর্শদাতার"। তাঁর সাংবাদিকতা, সাহিত্য বা যাই তিনি করুন না কেন, সবকিছুর মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজনীতি থেকেই এসেছে তাঁর সাহিত্য। তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় ছোট করে দেখার মত নয়। ব্যংগ সাহিত্য রচনা করে তিনি সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন। সেকালের মাসিক 'সওগাত'-এ তাঁর বহু গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তবে সাহিত্য অংগনে তিনি বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন রাজনৈতিক ব্যংগ কাহিনী লিখে। এই ধারায় তাঁর গল্পগ্রন্থ 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স' পাঠকদের বিপুল সমাদর লাভ করেছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর বইয়ের সংখ্যা শিশুপাঠ্য তিনখানি ও 'নয়াপাড়া' নামে ৪টি টেক্সট বইসহ মোট ১৯টি। গ্রন্থ তালিকা নিম্নরূপ : মুসলমান কথা (১৯২৪), আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), ছোটদের কাছাছুল আম্বিয়া—দুই খণ্ড (১৯৫০), সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবন ক্ষুধা (১৯৫৫), গালিভারের সফর নামা (১৯৫০), আসমানী পর্দা (১৯৫৭),

পরিবার পরিকল্পনা (১৯৬৭), পাক বাংলার কালচার, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), আবেহায়াত (১৯৬৯), শেরে বাংলা হইতে বংগবন্ধু (১৯৭২), য়েণ্ড অব বিট্রায়াল (১৯৭৪), কোরআনের নসিহাত (১৯৭৫), আত্মকথা (১৯৭৮), বেশী দামে কেনা অল্প দামে বেচা স্বাধীনতা (১৯৮০)।

বাঙালী মুসলমানদের সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ আবুল মনসুর আহমদ ১৯৭৯ সনে ৮১ বছর বয়সে ঢাকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবদুস সালাম

বাংলাদেশে ইংরেজী সাংবাদিকতার ইতিহাসে আবদুস সালামের (১৯১০-১৯৭৭) নাম সর্বাগ্রে করতে হবে। তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার (বর্তমানে বাংলাদেশ অবজারভার)-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি সমগ্র পাকিস্তানে খ্যাতনামা ছিলেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে (যেখানে বাংলা ভাষার চর্চাই প্রধান) একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিক সম্পাদনা করা খুব সহজ কাজ ছিলনা। আবদুস সালাম তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, নীতিবোধ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে সেকালে 'পাকিস্তান অবজারভারকে' একটি বিশিষ্ট দৈনিকে পরিণত করেছিলেন। সাংবাদিকতার মান ও ইংরেজী ভাষার যথার্থ ব্যবহারে 'পাকিস্তান অবজারভার' শুধু পাকিস্তানেই নয়, বিদেশেও বিশিষ্ট দৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

১৯৫০ সন থেকে ১৯৭২ সন পর্যন্ত তিনি একটানা 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর সম্পাদক ছিলেন। পাঠকদের কাছে একসময় 'অবজারভার' আর 'আবদুস সালাম' নাম দুটি প্রায় সমার্থক ছিল। সে সময় ইংরেজী পত্রিকা হিসেবে 'পাকিস্তান অবজারভার' যে মর্যাদা ও কৌলিন্য লাভ করেছিল তা-সম্ভব হয়েছিল তাঁর মতো সুশিক্ষিত সম্পাদকের নেতৃত্বের জন্য। পাকিস্তান আমলে বিরোধী কণ্ঠস্বর হিসেবে 'পাকিস্তান অবজারভার' মুসলিম লীগের স্বৈরাচার ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে-ভাবে সোচ্চার ছিল তাও এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। আর এই অধ্যায়ে যিনি সাহসিকতার সংগে 'পাকিস্তান অবজারভার' -এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি সম্পাদক আবদুস সালাম। 'পাকিস্তান অব-

জারভার'-এর মালিক হামিদুল হক চৌধুরী। এ প্রসংগে সংবাদপত্র পরিচালনায় তাঁর নীতিকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে। 'পাকিস্তান অবজারভার' -এর কীর্তির সংগে সংগে আবদুস সালাম এর কীর্তিও আজ অমর। এদেশের স্মরণীয় সাংবাদিকদের মধ্যে তাই তাঁর নামও শ্রদ্ধার সংগে উচ্চারণ করতে হয়।

সাংবাদিকতা পেশায় যোগদানের বিশেষ কোন প্রস্তুতি আবদুস সালামের ছিলনা। তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে। সাংবাদিকতা পেশায় না এলে হয়তো একজন সরকারী চাকুরে হিসেবে অবসর গ্রহণ করতেন। আজ যেভাবে তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় সেভাবে আমরা তাঁকে হয়তো চেনার বা জানার সুযোগই পেতামনা। কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। তা কোন সামান্য পদে নয়, একেবারে 'সম্পাদক' পদে। এবং 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায়।

আবদুস সালামের জন্ম নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানার ধর্মপুর গ্রামে ১৯১০ সালে। ১৯২৬ সালে তিনি ফেনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ফেনী কলেজে, অধ্যাপক হিসেবে। এরপর তিনি যোগ দেন সরকারী আয়কর বিভাগে। পরে সিভিল সাপ্লাই বিভাগে যোগদান করে কলকাতা রেশনিং-এর 'টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর একাউন্টস' পদে উন্নীত হন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল-এর পদে যোগ দেন।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার সংবাদপত্র জগৎ সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট যখন ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে কোন দৈনিক সংবাদপত্র ছিলনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সংকল্প ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র ও তরুণরা এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

তাঁরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই ভাষা আন্দোলনের পেছনে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের চেতনাবোধ।

এই পটভূমিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে উর্ধে তুলে ধরে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা থেকে 'পাকিস্তান অবজারভার' প্রকাশিত হয়। 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর মালিক হামিদুল হক চৌধুরী একজন রাজনীতিক। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। মন্ত্রিসভায় থাকার সময়ে তিনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে সোচচার ছিলেন। সেসময় তিনি 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা প্রকাশ করে তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আরো জোরদার করে তোলেন। 'পাকিস্তান অবজারভারে' "ইকনমিক নোটস্" নামে তখন একটি তীক্ষ্ণ কলাম লেখা হতো। এই কলামের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কিভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য গড়ে উঠছে ও পূর্ব পাকিস্তানের বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন কেন প্রয়োজন তা অত্যন্ত শাণিত যুক্তি ও তীব্র ভাষায় তুলে ধরা হতো। এই কলামটি ছদ্মনামে লিখতেন আবদুস সালাম। তখনো তিনি সরকারী চাকুরে। তখন পাঠকদের মধ্যে খুব কম লোকেই জানতেন কলামটির লেখককে। এই কলাম এবং সেই সংগে 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা পাঠক মহলে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। পত্রিকাটি ইংরেজী ভাষায় হওয়াতে পশ্চিম পাকিস্তানী পাঠকদের কাছেও পূর্ব পাকিস্তানের সেন্টিমেণ্ট ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে।

বলা যেতে পারে, 'ইকনমিক নোটস্' কলামটির মাধ্যমে আবদুস সালাম সাংবাদিকতা পেশার সংগে জড়িত হন। এসময় তিনি 'অবজারভার'-এর জন্য মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় লিখতেন। অবজারভার'-এর নিজস্ব স্টাফের মধ্যে তখন সম্পাদকীয় লিখতেন মাত্র দু'জন। জহুর হোসেন চৌধুরী ও আবদুল হাই। জহুর হোসেন চৌধুরী শুরু থেকে 'অবজারভার'-এর সংগে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি দৈনিক 'সংবাদ'-এর সম্পাদক হয়ে চলে যান। জহুর হোসেন চৌধুরী আবদুস সালাম সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"সালাম ভাই লেখার পর থেকে পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদকীয় সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং ব্যাপক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।"

আবদুস সালাম তখন ঢাকায় একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কর্মরত। সরকারী চাকরী করলেও সরকারের ভ্রান্ত ও দমনমূলক নীতি সম্পর্কে তাঁর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল। এ কারণে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি খুবই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর এই ক্ষোভ প্রকাশ পেতো 'অবজারভার'-এর 'ইকনমিক নোটস্' কলাম ও সম্পাদকীয়তে। কিন্তু এসব লিখেও তাঁর ক্ষোভ প্রশমিত হতোনা। তিনি চাইতেন আরও তীব্রভাবে পশ্চিমা শাসক-গোষ্ঠীর উপর কলমের আঘাত হানতে। তাদের স্বরূপ উন্মোচন করতে। তিনি চাইতেন, 'অবজারভার' যেন এ লড়াইয়ে অস্ত্রের মতো ভূমিকা পালন করে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি যে পূর্ব পাকিস্তানকে 'কলোনী' করে রাখতে চায় তার প্রতিবাদে তিনি 'অবজারভার'কে আরো শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন।

এ সময় হামিদুল হক চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর হামিদুল হক চৌধুরী নূরুল আমিনের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে তিনি সমর্থন দিতে পারেননি এবং তাঁর পত্রিকা 'পাকিস্তান অবজারভার' বাঙালীদের দাবীকে বড় বেশী 'প্রশ্রয়' দিচ্ছিলেন—এই দুটো ছিল তার অপরাধ। মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসার পর হামিদুল হক চৌধুরীর পত্রিকা 'অবজারভার' পুরোপুরি বিরোধী দলীয় পত্রিকা হয়ে যায়। পত্রিকার পাতা ভরে ওঠে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের সমালোচনায়। 'পাকিস্তান অবজারভার'ই হল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দলীয় পত্রিকা। পত্রিকাটি অচিরেই পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙখার প্রতীক হয়ে উঠলো।

আবদুস সালাম এসময় মনস্থির করেন সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতা পেশায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি তার এই আগ্রহের কথা হামিদুল হক চৌধুরীকে জানালে জনাব চৌধুরী তাতে সম্মত হন এবং আবদুস সালাম ১৯৫০ সালের ৩রা জুন 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর সম্পাদক পদে যোগ দেন।

সম্পাদক পদে যোগ দিয়ে তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে শুরু করেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অফিসে থাকতেন। নিজে লিখতেন। অন্যের লেখা পরিমার্জনা করতেন। পত্রিকা নিয়ে পরিকল্পনা করতেন। 'অবজারভার'কে একটি শীর্ষস্থানীয় কাগজ করার জন্য তিনি কঠিন পরিশ্রম করেন। পত্রিকার

কাজ ছাড়াও 'অবজারভার'-এর সম্পাদকের কামরা ছিল শহরের এক প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থল। 'অবজারভার' যেহেতু তখন বিরোধী দলীয় পত্রিকা তখন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারাও 'অবজারভার'-এ আসতেন। মওলানা ভাসানী প্রায় ঘন ঘন আসতেন। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় আবদুস সালামের কামরা মুখর হয়ে থাকতো। এভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আবদুস সালামের পক্ষে দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও রাজনীতিকদের মন বুঝতে সুবিধা হতো। এসময় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সংগে আবদুস সালামের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তফাজ্জল হোসেন তখন সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক'-এর সংগে জড়িত। 'অবজারভার' সম্পাদকের কামরার রাজনৈতিক আডডায় তফাজ্জল হোসেনও ছিলেন একজন নিত্য অতিথি।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ নিয়ে 'অবজারভার'-এর বিরামহীন লেখা কেন্দ্রীয় সরকার কখনো পছন্দ করেনি। ইংরেজী কাগজ হওয়াতে 'অবজারভার'-এর লেখা পশ্চিম পাকিস্তানে, এমনকি বিদেশেও, মুসলিম লীগ সরকারের ভাবমূর্তি যথেষ্ট নষ্ট করতে সহায়ক হয়েছিল। সেজন্য 'অবজারভার' সম্পর্কে পাকিস্তানী শাসকদের একটা বিদ্বেষভাব ছিলই। কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ খুঁজছিলেন 'অবজারভার'-কে বেকায়দার ফেলার জন্য। সেরকম একটা সুযোগ হঠাৎ পাওয়া গেল।

১৯৫২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী 'অবজারভার'-এর এক সম্পাদকীয়তে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সমালোচনা করতে গিয়ে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছিল। এই লেখাকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ ধূয়া তুলল, 'লেখায় হযরত ওসমান (রাঃ)-কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।' এ নিয়ে সাম্প্রদায়িক মহল বেশ কিছুদিন হৈ চৈ করে। সরকার সমর্থক দৈনিক পত্রিকায় বলা হয়েছিল : 'এই গর্হিত অপরাধের কারণে সরকার যদি 'অবজারভার'-এর বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না নেয় তাহলে জনগণই তা নেবে'। পুরো ব্যাপারটিই ছিল সাজানো। তাই এই হৈ চৈ-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকার 'অবজারভার'-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতে সম্পাদক আবদুস সালামসহ পত্রিকার সাংবাদিক ও কর্মচারীরা এক অবর্ণনীয় আর্থিক কষ্টের মুখোমুখি হন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন হয়। সরকার সমর্থক ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' ভাষা

আন্দোলনের বিরোধিতা করে ক্রমাগত লিখতে থাকলে বিক্ষুব্ধ জনতা ২২শে ফেব্রুয়ারী সকালে 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আবদুস সালামকে সরকার এই ঘটনার সংগে জড়িত করে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, তিনি 'মর্নিং নিউজ' জ্বালানোর ঘটনার পেছনে জড়িত ছিলেন। মালিক হামিদুল হক চৌধুরীকে একই সংগে একই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। আজীবন ভায়োলেন্স বিরোধী শান্তি প্রিয় আবদুস সালামকে কারাগারে যেতে হল ভায়োলেন্সের অভিযোগে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনের আগে সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' দৈনিক-এ রূপায়িত হয়েছে এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিরোধী দলীয় জোট 'যুক্তফ্রণ্ট'। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক ব্যাপক গণজাগরণ স্মৃষ্টি হয়। সাংবাদিক আবদুস সালাম এসময় রাজনীতির সংগে জড়িয়ে পড়েন এবং যুক্তফ্রণ্টের মনোনয়ন নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং 'যুক্তফ্রন্ট' বিপুলভাবে জয়লাভ করে। 'যুক্তফ্রন্ট' ক্ষমতালাভের পর 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর প্রকাশনা আবার শুরু হয়। এ পর্যায়ে সমগ্র পাকিস্তানে সম্পাদক হিসেবে তিনি বিশেষ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হলেও তিনি সক্রিয় রাজনীতির সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি সাংবাদিক হয়েই রইলেন।

ষাটের দশকে 'পাকিস্তান অবজারভার' আধুনিক সাংবাদিকতায় এক চমক স্মৃষ্টি করে। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে যে 'অবজারভার' প্রধানতঃ রাজনৈতিক সাংবাদিকতা করেছে ষাটের দশকে সেই 'অবজারভারই সাংবাদিকতায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। 'অবজারভার'-এর এক্সক্লুসিভ নিউজ ষ্টোরি, ছবি, ছবি সম্পাদনা সর্বোপরি মেকাপ পাঠকদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তখনো পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সংবাদপত্র গতানুগতিক ধারায় প্রকাশিত হতো। 'পাকিস্তান অবজারভার'ই প্রথম আধুনিক সাংবাদিকতা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে সম্পাদক আবদুস সালাম এর নেতৃত্ব ছাড়াও বিলেতে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক এ. বি. এম. মূসার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণবিক্ষোভে এই সময়টা ছিল সবচেয়ে উত্তপ্ত। এবং এই সময়েই পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ও পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই জনমত গড়ে তোলার পেছনে দৈনিক 'ইত্তেফাক' ও 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর অবদান সবচে বেশী। আবদুস সালাম সেসময় সমগ্র পাকিস্তানে একজন বিশেষ সম্পাদক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন। তৎকালীন 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদের' (সিপিএনই) তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনি 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদের' সভাপতি হয়েছিলেন। আইয়ুব আমলে সংবাদপত্রের উপর নিপীড়ন ও দমননীতি নেমে আসতো। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী নিয়ে যাঁরাই লিখেছেন তাঁদের উপর নিপীড়ন হয়েছে নানাভাবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে বারবার। এদেশের সাংবাদিক সমাজ তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে ও কালাকানুনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছে। আবদুস সালাম সবসময় এসব সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন এবং বিভিন্ন ফোরামে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেছেন।

কেন্দ্রে কনভেনশন মুসলিম লীগের আইয়ুব সরকারের দোর্দণ্ড প্রতাপে অনেকে কম্পমান থাকলেও তিনি কখনো এতটুকু ভীত হননি। তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নানা উপলক্ষে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সংগে রাওয়ালপিণ্ডিতে বৈঠকে বসতেন। পূর্ব পাকিস্তানের তিনজন সম্পাদক আবদুস সালাম (অবজারভার), তফাজ্জল হোসেন (ইত্তেফাক), জহুর হোসেন চৌধুরী (সংবাদ) এসব বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ নিয়ে সোচ্চার অংশ নিতেন। এই তিনজন সম্পাদকের যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনার জবাব দেয়া আইয়ুব খান ও তার আমলাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হতোনা। শুরু থেকেই এই তিনটি কাগজ আইয়ুব খানকে শান্তিতে শাসন করতে দেয়নি এবং আইয়ুবের পতনের আগে পর্যন্ত এই তিনটি কাগজ অবিরাম লিখে গেছে। এই কারণে তিনটি কাগজ 'ব্ল্যাকলিস্টেড' হয় ও সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হয়।

আইয়ুব খানের সংগে সম্পাদকদের যত বৈঠক হয়েছে প্রায় সব বৈঠকে আবদুস সালাম ধীর, স্থির, যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন। তিনি আইয়ুব খানের মুখ চেয়ে কথা বলতেন না। তিনি যা বলতেন, তা

যে আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই বলতেন, এতে সবাই নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর এই ব্যক্তিত্ব ও স্পষ্টবাদিতার জন্য আইয়ুব খানও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। শুধু ব্যক্তি সালামকে শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদকীয় মতামতকে আইয়ুব খান অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

আইয়ুব আমলে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একজন সাংবাদিক হিসেবে আবদুস সালাম যেভাবে লড়াই করেছেন তা এ দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়।

সাংবাদিক সমাজে আবদুস সালাম আরো একটি বিশেষ কারণে শ্রদ্ধেয়। সেটা হল তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন সুশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি। বিশেষ করে, ইংরেজী ভাষার উপর তাঁর দখল অতুলনীয়। তাঁর ইংরেজী লেখায় এমন চমৎকার একটা প্রাণবন্ত গতি ছিল যা সচরাচর দেখা যায়না। এদেশে হাতে গোণা ভাল ইংরেজী জানিয়েদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। 'অবজারভার'-এর সেই প্রথম যুগে, যখন তিনি সাংবাদিকতা পেশায় পুরোপুরি আসেননি, তখন তিনি যেসব সম্পাদকীয় লিখতেন তা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে তাঁর মুন্সিয়ানায়। হিউমারিস্ট হিসেবেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু শুধু ইংরেজী ভাষার উপর তাঁর দখলের জন্য তাঁকে জ্ঞানী মনে করা হয়না। অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর অগাধ দখল ছিল। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা কত তার প্রমাণ 'অবজারভার'-এ লেখা তাঁর 'ইকনমিক নোটস্' কলাম। এ ছাড়া 'মালস' ছদ্মনামে তিনি 'আইডল থটস্' নামে একটি ব্যংগাত্মক কলাম লিখতেন। স্যাটায়ার রচনায়ও যে তিনি কত পারদর্শী ছিলেন উক্ত কলাম পড়লে তা বোঝা যায়।

তাঁর শিক্ষিত মানসের পেছনে একটা বড় কারণ ছিল পড়াশুনার ব্যাপ্তি। তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত পড়ুয়া। বই ছিল তাঁর অবসরের সংগী। বই সম্পর্কে তাঁর বিশেষ বাছবিচার ছিলনা। সব ধরনের বই-ই তিনি প্রায় পড়তেন। ক্রাইম নভেল, সায়েন্স ফিকশন থেকে শুরু করে অর্থনীতি বা অংক বিষয়ক যে কোন টেকনিক্যাল বইও তিনি পড়তেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অগাধ পড়াশুনা তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মর্যাদা দিয়েছিল। তিনি ছিলেন অনেকের মধ্যে বিশিষ্ট এবং এ্যাভারেজের উর্ধ্বে। তাঁর মতো সুশিক্ষিত, মননশীল ও সত্যিকার অর্থে বুদ্ধিজীবী আমাদের সাংবাদিক সমাজে বিরল। তাঁর লেখা মেধাবী সম্পাদকীয়গুলো আজো তাঁর

প্রজ্ঞা আর মননের সাক্ষী হয়ে আছে। 'অবজারভার'-এ প্রকাশিত বহু সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত কলাম তাঁর অনবদ্য ইংরেজীর স্বাক্ষর বহন করে। এদেশের ইংরেজী সাংবাদিকতা তথা খবরের কাগজে ইংরেজী লেখালেখিতে তাঁর পাশে তুলনা দেয়ার মতো দ্বিতীয় নামটিও নেই।

এত বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হয়েও অহংকার তাঁকে কখনো গ্রাস করেনি। তিনি সর্বদা সাধারণভাবেই থাকতেন। অসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের মতো জীবন যাপন করতেন। অনাড়ম্বরতা ও সারল্য ছিল তাঁর ভূষণ। সবমিলিয়ে তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে মননশীলতা ও হৃদয়বৃত্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রীকতা, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি সহজলভ্য ব্যাপারগুলো থেকে তিনি সর্বদা দূরে ছিলেন। বরং তিনি তাঁর অধীত জ্ঞান ও শিক্ষাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানের পূজারী ছিলেন বলেই কোন হীনতা বা ক্ষুদ্রতা তাঁকে দখল করতে পারেনি। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন সব উজ্জ্বল গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল যা আজকাল সচরাচর দেখা যায়না।

আবদুস সালাম সাংবাদিকতা পেশাকে খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। সত্য ভাষণের বিশ্বস্ত আর বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে তিনি গণ্য করতেন সংবাদপত্রকে। তাই তিনি সাংবাদিক জীবনে যা কিছু দেশের জন্য কল্যাণকর বলে জেনেছিলেন, তা যত অপ্রিয় হোক, অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর সম্পাদকীয় রচনায়। আইয়ুব খানের মতো প্রতাপশালী একনায়ককেও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আত্মজীবনী 'ফ্রেণ্ডস নট মাষ্টারস' গ্রন্থে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যথাযথ চিত্র প্রতিফলিত হয়নি বলে তিনি স্বনামে লিখে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কোনরকম হুমকিতে তিনি কখনো কম্পিত হননি। এজন্যে অবশ্য পাকিস্তান আমলে তাঁকে নানাভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি সাংবাদিকতায় সত্য প্রকাশে বিরত হননি কখনো। তাঁর এই বিবেকবোধ তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশে এমন এক অপ্রিয় পরিস্থিতির মুখোমুখি করে তুলেছিল যা শুধু অপ্রত্যাশিত ছিলনা, অকল্পনীয়ও ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর 'পাকিস্তান অবজারভার' পরিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করে। নতুন নাম হয় 'বাংলাদেশ অবজারভার'। সম্পাদক পদে তিনিই বহাল থাকেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে সারা দেশে নানা বিশৃঙ্খলা ছিল। তখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়।

কিন্তু দেশের অবস্থা এতটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল যে তখন অনেকেই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। দেশের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পটভূমিতে আবদুস সালাম 'বাংলাদেশ অবজারভারে' 'দি সুপ্রীম টেস্ট' (১৫ই মার্চ, ১৯৭২) শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। এই সম্পাদকীয়তে তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাংবিধানিক জটিলতার প্রশ্নে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'বাংলাদেশ অবজারভার' তখন এক অর্থে সরকারী পত্রিকা। সরকারী পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি যা সত্য বলে ভেবেছেন তা লিখতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এই 'সম্পাদকীয়' অনুমোদন করতে পারেনি। এই সম্পাদকীয় লেখার 'অপরাধে' আবদুস সালামকে 'বাংলাদেশ অবজারভার'-এর সম্পাদক পদ থেকে অবসর গ্রহণে সরকার বাধ্য করেন। তিনি অম্লানবদনে সরকারের এই নির্দেশ মেনে নেন। তবু তিনি তাঁর সত্য প্রকাশ থেকে বিরত হননি। সত্যপ্রিয় আবদুস সালাম এভাবে একটি যুগোপযোগী সম্পাদকীয় লিখে চাকরী হারান।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সক্রিয় সাংবাদিকতার সংগে তাঁর সম্পর্কের ইতি হয়।

পরে তিনি প্রথমে 'মর্নিং নিউজ' ও পরে 'বাংলাদেশ টাইমস' পত্রিকায় ও মাঝে মাঝে 'ইত্তেফাকে' বিশেষ অনুরোধে সম্পাদকীয় লিখতেন। এ ছাড়া লণ্ডনের "দি ইকনমিস্টের' ফরেন নিউজ ডিপার্টমেন্টের হেড Emily Macfaker-এর অনুরোধে সে পত্রিকায়ও লিখতেন। সংবাদপত্রের সংগে তাঁর আর সক্রিয় যোগাযোগ ছিলনা। মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া তিনি তখন একরকম অবসর জীবনযাপন করছিলেন।

এর মধ্যে দেশের রাজনীতিতে বেশ পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। ক্ষমতায় আসেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ। তিনিও বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। সিপাহী জনতার বিপ্লবের ফল হিসেবে ১৯৭৫ -এর ৭ই নভেম্বর ক্ষমতায় আসেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাঁর আগ্রহে ও সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট। কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দান ও গণমাধ্যম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সরকার আবদুস সালামকে এই ইনস্টিটিউটের প্রথম মহাপরিচালক পদে নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তির

মাধ্যমে তিনি আবার সাংবাদিকতা পেশার সংগে পরোক্ষভাবে জড়িত হন। এখানেও আবদুস সালাম তাঁর প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দিয়ে নতুন এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি এই কাজ করতে পারেননি। ১৯৭৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী আবদুস সালাম প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে কর্মরত থাকার সময় ইন্তেকাল করেন।

সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার ১৯৭৬ সালে তাঁকে 'একুশে পদকে' ভূষিত করেন।

এ দেশের সাংবাদিকতায়, বিশেষ করে ইংরেজী সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান অনাগতকালেও স্মরণ করতে হবে। সাংবাদিকতার সংগে বুদ্ধি-বৃত্তির যোগসাধনে তিনি এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)

সাংবাদিকতাকে যিনি গণচেতনার মৌল চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন তিনি তফাজ্জল হোসেন (১৯১১-১৯৬৯)। দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি 'মানিক মিয়া' নামেও পরিচিত। তাঁর কালে সমাজের সর্বস্তরের পাঠকের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়। তবে তাঁর পোষাকী নামে তিনি যত না পরিচিত ছিলেন তারচেয়ে বেশী পরিচিত ছিলেন 'মোসাফির' নামে। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' নামে একটি কলাম লিখতেন 'মোসাফির' ছদ্মনামে। ছদ্মনাম নিলেও প্রায় সবাই জানতেন 'মোসাফির' হলেন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন। তা জানলেও পাঠকরা তাঁকে 'মোসাফির' নামেই বেশী চিনতেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে 'রাজনৈতিক মঞ্চের' চেয়ে পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় কলাম আজ অবধি লেখা হয়নি। 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কত জনপ্রিয় ছিল তা এখনকার সংবাদপত্র পাঠকদের ঠিক লিখে বোঝান যাবেনা।

তফাজ্জল হোসেনের পত্রিকা 'ইত্তেফাক' নিছক একটি সংবাদপত্র ছিলনা। এখনকার 'ইত্তেফাক' বা অন্যান্য সংবাদপত্র দেখে মানিক মিয়ার 'ইত্তেফাককে' বিচার করা যাবেনা। সে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাল। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ সন মানিক মিয়া ও 'ইত্তেফাক'-এর সোনালী অধ্যায়। সে সময়ের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি সবকিছুই এর পটভূমি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তখন পাকিস্তান সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে। আমরা বাস করি পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ১৯৪৮ সনে ও ১৯৫২ সনে পর পর দুবার বাংলা ভাষার

জন্য আন্দোলন হয়েছে পূর্ব বাংলায়। বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বাংলা ভাষার আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন কয়েকজন। কেন্দ্রে ও পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার, দমননীতি ও নিপীড়নে দেশব্যাপী জনগণ সোচ্চার। শুধু ভাষাগত প্রশ্নে নয় নানা অর্থনৈতিক দিকেও পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের বঞ্চনা, অবিচার, শোষণ ও অত্যাচার চলছেই। ফলে পূর্ব বাংলার সচেতন মানুষ পাকিস্তানী শাসকদের এই অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সচেতন হতে শুরু করলেন। বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ উঠতে থাকল। এসময় পূর্ব বাংলার প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, নাম 'ইত্তেফাক'। পরবর্তি কালে এই 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক, মালিক হয়েছিলেন তফাজ্জল হোসেন। 'ইত্তেফাক'-এর পাতায় 'রাজনৈতিক মঞ্চ' নামে কলাম লিখে তিনি পূর্ববাংলার সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, যে লেখা তাঁকে অমর করে রেখেছে।

তফাজ্জল হোসেন সাংবাদিক হয়েছেন ঘটনাচক্রে। তাঁর পক্ষে রাজনীতিবিদ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য তিনি সাংবাদিকতা পেশায় আসলেও রাজনৈতিক আবহ থেকে মুহূর্তের জন্য নিজেকে সরিয়ে নেননি। তিনি ঈর্ষণীয় ক্ষমতাবলে সাংবাদিকতাকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। অসির চেয়ে যে মসী শক্তিশালী—একথা তফাজ্জল হোসেন কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করে গেছেন।

তফাজ্জল হোসেনের প্রাথমিক জীবন অন্য দশজন বাঙালীর মতোই সাধারণ। বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১১ সালে তফাজ্জল হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মুসলেহ উদ্দিন মিয়া। শৈশবে তাঁর মা মারা যান। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রাইমারী শিক্ষা শেষে ভাণ্ডারিয়া হাই স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। স্কুল জীবনেই তাঁর মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পিরোজপুর সরকারী হাই স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করার পর পিরোজপুর সিভিল কোর্টে চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

পিরোজপুর কোর্টে এক ঘটনায় তাঁর প্রতিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কোর্টের জনৈক মুন্সেফ তাঁর প্রতি অবমাননাকর আচরণ করলে

তিনি প্রতিবাদে চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। পরে অবশ্য মুন্সেফ অনুতপ্ত হলে তিনি চাকরীতে ফিরে আসেন।

পিরোজপুর কোর্টে কর্মরত থাকা কালে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংগে পরিচিত হন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। তখন উপ-মহাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন চলছে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখনই একজন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা। সোহরাওয়ার্দীর সংগে তফাজ্জল হোসেনের এই যোগাযোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে তফাজ্জল হোসেনের জীবনে সোহ্‌রাওয়ার্দী এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

পিরোজপুরে পরিচিত হবার পর সোহ্‌রাওয়ার্দী তফাজ্জল হোসেনের বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, চিন্তাধারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হন। তফাজ্জল হোসেন সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বে ও আদর্শে আকৃষ্ট হন। এভাবেই দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় তফাজ্জল হোসেন বাংলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগে বরিশালের জনসংযোগ অফিসার পদে চাকরী লাভ করেন। এটাই গণসংযোগ পেশায় তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। বরিশালে এই নতুন চাকরী কিছুদিন করার পর সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরামর্শে তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে দিলেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ-এর অফিস সেক্রেটারী নিয়োগ করেন।

মুসলিম লীগ অফিসে কাজ করার সময় তিনি রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন ও উপমহাদেশের অনেক খ্যাতনামা রাজনীতিবিদের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সংগে তাঁর পরিচয় হয়। নানা রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে কাজ করে তাঁর নিজেরও একটা মতাদর্শ দানা বাঁধতে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'ভাব শিষ্যত্ব' গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা থেকে একটা বাংলা দৈনিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। নাম : 'ইত্তেহাদ'। আবুল মনসুর আহমদকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। তফাজ্জল হোসেন মুসলিম লীগ অফিসের চাকরী ছেড়ে দিয়ে 'ইত্তেহাদ'-এর পরিচালনা বিভাগে সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। এভাবেই তফাজ্জল হোসেন সংবাদপত্র জগতে পা রাখেন। তফাজ্জল হোসেন 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার ম্যানেজমেন্টে তাঁর প্রতিভা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন। এখানে উল্লেখ

করা প্রয়োজন, সেসময় দৈনিক 'ইত্তেহাদ' সবদিক থেকে একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে পরিণত হয়েছিল।

'ইত্তেহাদ'-এ তফাজ্জল হোসেন যদিও পরিচালনার সংগে জড়িত ছিলেন তবু তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধ লেখার হাতেখড়িও 'ইত্তেহাদ'-এ। বলা যায়, পরবর্তী কালের জনপ্রিয় 'মোসাফির'-এর জন্ম এভাবেই। মাত্র এক বছরের বেশী সময় তফাজ্জল হোসেন 'ইত্তেহাদ'-এর সংগে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর নানা রাজনৈতিক কারণে 'ইত্তেহাদ' কলকাতা থেকে ঢাকায় আসতে পারেনি।

১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্ম নেয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। সেই বছরই দলের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক'। আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হলেন সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক। ১৯৫১ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে তফাজ্জল হোসেন এই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তখন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নানারকম উত্থান-পতন ঘটছে। কেন্দ্রে ও প্রদেশে মুসলিম লীগের প্রতাপ। 'মুসলিম লীগকে গদি থেকে নামাতে হবে' সারা পূর্ব বাংলায় একটাই আওয়াজ। রাজনৈতিক অংগনে বিরাজমান এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় 'ইত্তেফাক' সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। তফাজ্জল হোসেন স্বয়ং এই পত্রিকার সম্পাদক হলেন।

দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর তফাজ্জল হোসেন পত্রিকাটিকে মুসলিম লীগ বিরোধী ও পূর্ব বাংলার বঞ্চিত গণমানুষের মুখপত্র হিসেবে গড়ে তুলতে থাকেন। 'ইত্তেফাক' অল্পদিনের ভেতরেই সাধারণ পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন শুরু করে। 'ইত্তেফাক'-এর সুরটাই ছিল লীগ বিরোধী সুর। একদিকে 'ইত্তেফাক'-এ নানা ধরনের খবর অপরদিকে 'মোসাফির'-এর 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। পাঠকরা যেন গোগ্রাসে সবটা গিলতে থাকে। বিশেষ করে 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। এই কলামে তিনি অত্যন্ত অন্তরংগ ভাষায় ও সাদামাটাভাবে মুসলিম লীগ সরকারের নানা বৈষম্য, অত্যাচার, অবিচার ও বঞ্চনার কাহিনী তীক্ষ্ণভাবে লিখতে থাকেন। তাঁর এই কলাম ছিল মুসলিম লীগের জন্য হুল-এর মতো আবার লীগ বিরোধী

সাধারণ পাঠকদের কাছে বিরাট আনন্দের ব্যাপার। নির্বাচনের প্রাক্কালে মোসাফির এর-'রাজনৈতিক মঞ্চ' মুসলিম লীগ বিরোধী একটা জনমত গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অন্যান্য বিরোধী দল সংঘবদ্ধ হয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে 'ইত্তেফাক' অক্লান্তভাবে লিখতে থাকে। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। যুক্তফ্রন্টের এই নির্বাচনের সময় 'ইত্তেফাক' ও 'মোসাফির' পাঠকদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করে। 'মোসাফির' অর্জন করে বিপুল জনপ্রিয়তা। অনেকের ধারণা, যুক্তফ্রন্টের এই অভাবিত বিজয়ের পেছনে 'মোসাফির'-এর কালজয়ী লেখনী বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। 'সেদিন সমগ্র পূর্ব বাংলায় লীগ বিরোধী মানসিকতার ক্ষেত্রটি আগে থেকে তৈরী করে রেখেছিল মোসাফির'। ৫৪ সনের নির্বাচনের সময় মোসাফির পাঠকদের কাছে কতটা জনপ্রিয় হয়েছিলেন তা বোঝা যায় একটা ঘটনা থেকে। নির্বাচনোত্তরকালে যখন ঢাকা সমেত সমগ্র পূর্ব বাংলা বিজয়োল্লাসে স্পন্দিত তখন ঢাকায় রাজারবাগে মোসাফির-এর গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই প্রথম তফাজ্জল হোসেন ওরফে 'মোসাফির' পত্রিকার নেপথ্য ভূমিকা থেকে পাঠকদের সামনে সরাসরি হাজির হয়েছিলেন। সেই সংবর্ধনা সভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল।

১৯৫৪-এর নির্বাচনের পটভূমিতে মোসাফির তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' লিখে পাঠকদের মন যেভাবে জয় করেছিলেন তা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল। 'ইত্তেফাক'-এর পাঠকরা তাঁর লেখার প্রতি কখনো বিমুখ হননি। তাঁর লেখার ভংগী, বিষয়, ভাষা, উপস্থাপনা ও ধার সবই প্রায় অটুট ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

তিনি তাঁর কলামে প্রধানতঃ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পূর্ব বাংলাকে কিভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে সেটাই তিনি বার বার তাঁর লেখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অধিকার বঞ্চিত পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে তাই মোসাফির এত প্রিয় ছিলেন। সে সময় দৈনিক 'আজাদ'-এর মতো জনপ্রিয় কাগজের সংগে নতুন দৈনিক হিসেবে 'ইত্তেফাক' যে পাল্লা দিতে পেরেছিল তার পেছনে একটা মাত্র কারণ ছিল। তাহল : মোসাফিরের অসাধারণ ধারালো কলম। তাঁর লেখা কোন ইন্টেলেকচুয়াল লেখা ছিলনা। কিন্তু ইন্টেলেকচুয়ালরাও তাঁর লেখা

শ্রদ্ধার সংগে পড়তেন। তাঁর ভাষা ছিল অতি সাধারণ, আটপৌরে। তথাকথিত নাগরিক সপ্রতিভতা তাঁর লেখায় পাওয়া যেতনা। প্রায়শঃ তিনি আঞ্চলিক শব্দ, গ্রামীণ উপমা, প্রবাদ ব্যবহার করতেন। সাধারণ পাঠকও যেন রাজনীতি, অর্থনীতির জটিল পর্যালোচনা সহজে বুঝতে পারে সেটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বলা যায়, ভাষাই ছিল 'রাজনৈতিক মঞ্চের' প্রাণ। তাঁর এই কলাম পড়লে বোঝা যেতো মাতৃভূমিকে তিনি কত অন্তরংগভাবে জেনেছিলেন।

এই প্রসংগে ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছেন "সকল পাঠকের অন্তর স্পর্শ করতে হ'লে যে উষ্ণ, জীবনঘনিষ্ঠ ভাষার প্রয়োজন তাকে সহজে ধরতে পেরেছিলেন বলেই এদেশের মানুষও তাঁকে আপনজন হিসেবে বরণ করেছে। শুধু একটি কলাম লিখে স্মরণকালের মধ্যে কোনো সাংবাদিক এমন অবিস্মরণীয় ভাবমূর্তি তৈরী করতে পেরেছেন বলে মনে পড়েনা। আমাদের অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক এখন কথ্য ভাষাকেই খবর পরিবেশনার মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপান্তরেই কি কথ্যভাষার আবেদন ও ফলপ্রসূতা মেলে? বস্তুত তফাজ্জল হোসেনের গদ্যের ক্রিয়াপদ ও সাধুরূপ বাদ দিলে তার মর্মমূলে ছিল কথ্যভাষার শক্তি। এবং সেই ভাষা হয়তো কেতাদুরস্ত নাগরিক জীবনে বেমানান কিন্তু তার সজীবতা ও সৌন্দর্য খুঁজে নিতে সাধারণ পাঠকের কখনো অসুবিধা হয়নি।"

মোসাফির তথা 'ইত্তেফাক'-এর জনপ্রিয়তা কাল হয়েছিল তফাজ্জল হোসেনের। মোসাফির-এর সত্য ভাষণ পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্বেষী কেন্দ্রীয় শাসকচক্র কখনো সহ্য করতে পারেনি। তাই লেখার জন্য তাঁকে বার বার রাজরোষে পড়তে হয়েছে। পূর্ব বাংলার অধিকারের কথা তুলে ধরে তিনি দেশ প্রেমিকের দায়িত্ব পালন করলেও পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকচক্র তাঁর লেখার মধ্যে দেশদ্রোহিতার গন্ধ আবিষ্কার করতেন। ফলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে বার বার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, তাঁর পত্রিকা নিষিদ্ধ করেছে, তাঁর প্রেস বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু আইনের বিচারে তাঁকে কখনো দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের আক্রোশের শিকার হয়ে 'ইত্তেফাক' ও তফাজ্জল হোসেনকে নানাভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছে। কিন্তু তফাজ্জল হোসেন কখনো স্বৈরাচারের কাছে মাথা নত করেননি। তার কারণ, তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই সাংবাদিক, তিনি নিছক সংবাদপত্র ব্যবসায়ী ছিলেন না। সাংবাদিকতাকে

তিনি রাজনীতি ও দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিয়েছিলেন। যদি তিনি সংবাদপত্র প্রকাশনাকে শুধু ব্যবসা হিসেবে নিতেন তাহলে আইয়ুব আমলে স্বৈরাচারী সরকারের পছন্দমত লেখা লিখে তাদের নেক-নজরে থাকতে পারতেন। এতে তাঁর ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটতো এবং এক রকম আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু সেই মসৃণ পথে তিনি যাননি। কারণ ৫৪ সনের পর পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে যে ভাংগা গড়ার সূচনা হয় এবং পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে বৈষম্য, অবিচার ও বঞ্চনা চাপিয়ে দেয় তা তফাজ্জল হোসেন একজন সাংবাদিক হিসেবে কখনো মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর লেখনী ও পত্রিকার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিনিময়ে একদিকে তিনি লাভ করেছেন জনগণের শ্রদ্ধা অপরদিকে স্বৈরাচারী সরকারের নিগ্রহ।

সংবাদপত্র প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা প্রসংগে তফাজ্জল হোসেন জেল থেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> "সংবাদপত্রের মারফত দেশবাসীর যতটুকু খেদমত করা যায় তাই ছিল আমার লক্ষ্য। এই দিক দিয়া আমি ইত্তেফাককে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ বা অর্থোপার্জনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করি নাই। যে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই জনগণের অভাব, অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করাই ছিল আমার ব্রত।"

এই ব্রত পালন করতে গিয়ে তিনি বার বার নিগৃহীত হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের পর প্রথমবারের মতো 'ইত্তেফাক'-এর প্রকাশনা কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। ১৯৫৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সামরিক আইন লংঘনের মিথ্যা অভিযোগে তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। তখন অনেক নেতার সংগে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবী পেশ করে। ৬ দফার সমর্থনে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ৬৬ সালের ৭ই জুন হরতাল পালিত

হয়। ঐসময় আইয়ুব সরকারের দমননীতি ও স্বৈরাচার দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। বহু লোককে তখন গ্রেফতার করা হয়। ১৬ই জুন তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় এবং সংগে সংগে তাঁর 'নিউ নেশান প্রেস'ও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ফলে 'ইত্তেফাক' ও তাঁর অপর দুটি পত্রিকা 'ঢাকা টাইমস' ও 'পূর্বানী' বন্ধ হয়ে যায়। প্রেস বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে হাই কোর্টের রায়ে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে দ্বিতীয়বার প্রেস বাজেয়াপ্ত করেন।

প্রায় দশ মাস কারাযন্ত্রণা ভোগের পর ১৯৬৭ সালের ২৯শে মার্চ তিনি মুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি খুবই অসুস্থ। তিনি মুক্তি লাভ করলেও তাঁর প্রেস তখনো বাজেয়াপ্ত। ফলে জীবন জীবিকার পথ রুদ্ধ। সরকার তখন তাঁকে নানা প্রলোভন দিতে থাকে যাতে তিনি 'ইত্তেফাক'কে একটু নরম সুর করে প্রকাশনায় রাজী হন। কিন্তু তিনি তাঁর নীতিতে অটল। 'ইত্তেফাক' যদি তাঁর ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত হতে না পারে, তবে তিনি 'ইত্তেফাক' প্রকাশে আগ্রহী নন।'

তফাজ্জল হোসেনকে আরেকভাবে দেখলে একজন তুখোড় রাজনীতিবিদ বলা যায়। তবে তিনি সক্রিয় রাজনীতির পথ গ্রহণ করেননি। তাঁর রাজনীতি ছিল ষ্টেটসম্যানের রাজনীতি। বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞাই তাঁর রাজনীতির শক্তি। রাজনীতিবিদের লক্ষ্য যেমন থাকে মানুষের মুক্তি তেমনি তফাজ্জল হোসেনের লক্ষ্যও ছিল তাই। এই প্রসংগে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন :

> "তিনি কেবল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়েছেন বা গণতন্ত্রের জন্য কলম চালনা করেছেন বলা হলে তাঁর ভূমিকাকে ছোট করা হবে। আসলে নিজের অজান্তেই হয়তো তিনি কলম হাতে সাংবাদিকতায় নেমেছিলেন—বাংলাদেশের মানুষের ন্যাশনাল প্রাইড এবং ন্যাশনাল আইডিন্‌টিটি প্রতিষ্ঠার জন্য।"

একজন সাংবাদিক নিজের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে কতখানি সচেতন হলে একটা জাতির "ন্যাশনাল আইডিন্‌টিটি" প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যাপৃত হন, তফাজ্জল হোসেনের সাংবাদিক জীবন পর্যালোচনা করলে তা আঁচ করা যায়।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে এক অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। এই ভূমিকা পালিত না হলে পরবর্তীকালে

৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম খুব সহজসাধ্য হতোনা। যদিও তিনি স্পষ্টভাবে একটি পৃথক স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব তখন কল্পনা করেননি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে বাঙালীদের যে আদৌ বনিবনা হবে না বা দুই প্রদেশের যে এক সংগে সমতার ভিত্তিতে থাকা সম্ভব হবে না তা তিনি তাঁর অসংখ্য লেখায় পরোক্ষভাবে ইংগিত দিয়ে গেছেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি এ ক্ষেত্রে এক বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। এই ভূমিকার জন্যেই স্বাধীনতাত্তোরকালে তফাজ্জল হোসেন বাংলাদেশে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৯৬৯ সনে ব্যাপক গণ আন্দোলনের ফলে আইয়ুব সরকার 'ইত্তেফাক' ছেড়ে দেয়। দুবছর সাত মাস বন্ধ থাকার পর ১৯৬৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী 'ইত্তেফাক' পুনঃ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে একাধিকবার কারাবাস, রোগভোগ ও নানা রকম মানসিক চাপে তাঁর স্বাস্থ্য ভেংগে পড়ে। এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি আবার 'ইত্তেফাক' সম্পাদনা ও 'রাজনৈতিক মঞ্চ' লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। আবার নতুন উদ্যোমে 'ইত্তেফাক' বেরুতে লাগল। এসময় ৬৯ সালের ২৬শে মে ইত্তেফাকেরই সাংগঠনিক কাজে তিনি রাওয়ালপিণ্ডি যান। আর ৩১শে মে তারিখে পিণ্ডির এক হোটেলে আকস্মিকভাবে হার্টফেল করে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি শুধু যে একজন দায়িত্ববান ও আদর্শনিষ্ঠ অগ্রণী সাংবাদিককে হারিয়েছে তাই নয়, দেশের একজন বড় অভিভাবককেও হারিয়েছে।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এরকম নির্ভীক সাংবাদিক বিরল। পূর্ব বাংলার ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের দুঃসময়ে এই সাহসী 'মোসাফির' যে আলোর রশ্মি জ্বালিয়েছিলেন তা ছিল বাঁচার সংগ্রামে এক অন্তহীন প্রেরণা।

পরিশিষ্ট

যে ছয়জন স্মরণীয় সাংবাদিকের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা এই বইতে লেখা হয়েছে এবার পরিশিষ্টে সেই ছয়জনের লেখা সংকলন করা হল। লেখাগুলো বিশেষ কোন নিরিখে নির্বাচিত নয়।

পাঠকদের মধ্যে যাঁরা উল্লিখিত সাংবাদিকদের লেখা পড়ার সুযোগ পাননি তাঁদের একটা ধারণা দেবার জন্য এই লেখাগুলো সংকলন করা হল।

আলোচ্য সাংবাদিকদের এগুলো সাধারণ লেখা। সংবাদপত্রে তাঁরা নিয়মিত যেসব লেখা লিখতেন, তাঁদের যেসব লেখা পড়ে পাঠকরা উদ্দীপ্ত হতেন এগুলো তারই একটি। তাঁদের সাধারণ লেখাও যে কত অসাধারণ ছিল তা সংকলিত লেখাগুলো পড়লে বোঝা যাবে।

ভবিষ্যতে তাঁদের নির্বাচিত লেখার পৃথক পৃথক সংকলন প্রকাশিত হলে আগ্রহী পাঠকরা এই স্মরণীয় ও বরেণ্য সাংবাদিকদের চিন্তাধারা ও লেখনী ক্ষমতার সম্যক পরিচয় লাভ করবেন।

মৌলভী মুজিবর রহমান 'দি মুসলমান' পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ লিখতেন 'চরিত্র প্রসংগে কয়েকটি কথা' তার একটি। এটি অনুবাদ করে ছাপা হয়েছে। লেখাটি আবুল ফজল প্রণীত 'সাংবাদিক মুজিবর রহমান' গ্রন্থ থেকে নেয়া।

মওলানা আকরম খাঁর বহু প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় ও সম্পাদকীয় মন্তব্য 'আজাদ', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। এখানে মওলানা আকরম খাঁর লেখা শেষ দুটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হয়েছে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হবার আগেই সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা মননশীল বহু প্রবন্ধ সেকালের নানা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এখানে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল। সেই চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে সাহিত্য, সাংবাদিকতা বা সংস্কৃতি নিয়ে তিনি কিরকম ভাবনা চিন্তা করেছিলেন এখানে তার পরিচয় মেলে।

আবুল মনসুর আহমদের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো ছাপা হয়েছে দৈনিক ইত্তেহাদে। কিন্তু ঢাকায় দৈনিক ইত্তেহাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সক্রিয়

সাংবাদিকতা থেকে অবসর নেবার বহু পরে ১৯৭২-৭৩ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক-এর জন্য উপসম্পাদকীয় লিখতেন। বাংলাদেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে নানা কথা চারদিকে। বিশেষ করে পাট নিয়ে। আবুল মনসুর আহমদ সেসময় 'ইত্তেফাক'-এ পাট নিয়ে মনোযোগ আকর্ষণকারী বেশ কিছু লেখা লিখেছিলেন। সংকলিত লেখাটি তার একটি। পাট বিষয়ে তাঁর এক লেখা সম্পর্কে সরকারের পাট দফতর প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। সংকলিত লেখাটি আবুল মনসুর আহমদের পাল্টা প্রতিবাদ।

আবদুস সালামের ইংরেজী গদ্যের কিছুটা স্বাদ পাওয়া যাবে তাঁর দুটি লেখায়। সেই বিতর্কিত সম্পাদকীয় ছাড়াও তাঁর একটি ব্যক্তিগত কলামও সংকলিত হল।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধান উৎস তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলাম। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান একবার উদ্দেশ্যমূলক ও বালসুলভ যুক্তির অবতারণা করেন। 'মোসাফির' এই কলামে সেই উক্তির জবাব দেন।

সংকলিত লেখাগুলো পড়ার সময়, লেখার সময়কাল ও তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পাঠকদের স্মরণ রাখা দরকার।

মু. জা

মৌলভী মুজিবর রহমান

চরিত্র প্রসংগে কয়েকটি কথা

চরিত্র আয়ত্বের আবশ্যকতা আর চরম গুরুত্ব সম্বন্ধে আদিযুগের দার্শনিক থেকে শুরু করে এ যুগের নবীনতম স্কুল শিক্ষক পর্যন্ত সবাই আলোচনা করছেন। অতীতে যত ধর্ম ছিল (আজকের দিনেও তার অভাব নেই) তারও নির্দেশ ছিল চরিত্র গঠনের এবং আধুনিক দর্শনেরও একই কথা।

এটি এক বহু আলোচিত এক ঘেয়ে বিষয় হলেও আজও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে চরিত্র শক্তির অধিকারী এ দাবী অচল। এ যদি এমন এক সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হতো যা অনায়াসলভ্য বা চুল, দাড়ি, নখের মত তা যদি বেড়ে উঠতো, স্বাভাবিক নিয়মে তাহলে তার আলোচনা নেহায়েত অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াতো। আমাদের অনেকেই বিষয়টিকে এক ঘেয়ে মনে করে—তার মানে এ বিষয়ে আমরা ভিতরে ভিতরে রাগে টং। কেন? চরিত্র সম্বন্ধে অতি কথনের ফলে মানব সমাজে তার প্রয়োজন কমে এসেছে বলেই যে আমাদের রাগ তা নয় বরং আমরা ভালো করেই জানি আমরা আমাদের আদর্শ থেকে এখনো বহুদূরে পড়ে আছি আর আমাদের ক্রোধেরও কারণ এটি। অনেকের ধারণা আমরা যে শুধু আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে আছি তা নয় অধিকন্তু আমরা পেছনে হটে যাচ্ছি। এ কারণে অনেকে অধৈর্য হয়ে আদর্শ বা লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তাই করে বসেন অস্বীকার। নৈতিক মূল্যবোধের 'পুরনো বা সেকেলে' আদর্শ সম্বন্ধে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা আমরা শুনতে পাচ্ছি তা একদিকে যেমন মোটেও যুক্তি নির্ভর নয়, তেমন নয় তা পুরোনো মূল্যবোধের কার্যকরী প্রতিভূও। অনেক সময় এতে ফুটে ওঠে স্রেফ এক অধৈর্য মনের পরিচয় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তা হয়ে দাঁড়ায় নিজের পরাজয়েরই স্বীকৃতি। সব সমালোচনাই মন্দ একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের ধারণা সমালোচনা শান পাথরের মত সত্যকে সতেজ আর কার্যকরী করে তোলে। কিন্তু এমন এক ধরনের সমালোচনা বেড়ে গেছে যা নৈতিক আলোস্য আর হতাশারই সাক্ষাৎ ফসল। সত্যের পথ সব সময় সহজ মসৃন নয়। তাই তারা সত্যের কঠিন পথে বিচরণ করতে পারে না তারা নিজেরা যে ভুল পথে যাচ্ছে তা স্বীকার না করে বরং উল্টো বলে বসে সত্য-মিথ্যার কোন

তফাৎ নেই এ স্রেফ রেওয়াজ নীতির ব্যাপার। আমাদের ধারণা কিন্তু তা নয়। আর তা নয় স্রেফ খেয়াল যুক্তি নির্ভর। বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস একথা নিঃসন্দেহভাবে বারে বারে প্রমাণ করেছে যে নৈতিক গুণাবলী স্রেফ কতকগুলি রেওয়াজ রীতি নয়—তার চেয়ে অনেক বেশী। জাতি উন্নত হয় চরিত্র দিয়েই। যে জাতি চরিত্র রীতি গঠনকারী গুণাবলীকে স্রেফ রেওয়াজ রীতির বেশী মূল্য দেয় না তার পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নৈতিক আচরণে বিষয় বিশেষে গুরুত্ব আরোপে তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কতকগুলি মৌন ব্যাপার আছে যেমন সত্য, ন্যায় ইত্যাদি মানব চেতনার সূচনা থেকে যুগ যুগ ধরে এসব সমভাবে গুরুত্বের আসন দখল করে আছে। এসব চিরন্তন সত্যের উপরই মানব চরিত্রের ভিত রচিত হয়।

অবশ্য মনে রাখতে হবে চরিত্র মানে ব্যাপক অর্থে সাধুতা, সততা, দয়া, ক্ষমা, উদারতা, সত্য আর ন্যায়, নীতি, সৎ শুদ্ধতা, পাপের প্রতি ঘৃণা, নম্র ব্যবহার, ত্যাগ প্রবণতা, অন্যের মতামত আর অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা এসবই বুঝিয়ে থাকে অর্থাৎ এসবের সমন্বয়ে চরিত্র গড়ে ওঠে। এখানে চরিত্র গঠন সম্বন্ধে একটা রচনা লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমাদের উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে যাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী তাদের দৃষ্টি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আকর্ষণ করা, যা এখন প্রায় উপেক্ষিত।

শুধু ছেলেমেয়েদের নয় সকলেরই চরিত্র গড়ে তুলতে হয় বহু আয়াসে। বাড়ী, স্কুল আর যে বিচিত্র সমন্বয়ে সাধারণতঃ 'সামাজিক আবহাওয়া' বলা হয়—চরিত্র গঠনে এ সবের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। মাঝে মাঝে শুধু কতকগুলি প্রচলিত কেতাবী নীতি কথা পড়ে শুনালেই উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। পিতা মাতা বা শিক্ষকের আর যাদের ওপর চরিত্র গঠনের দায়িত্ব আছে, তাঁদের নিজেদের যদি চরিত্র না থাকে তাহলে সবরকম সৎ উপদেশ শুধু ব্যর্থ হবে তা নয় বরং ছেলে মেয়েদের মনে কপটতা অনুপ্রবেশ করে ওদের নৈতিক উপাদানটাই করে দেবে নষ্ট।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বর্তমানে এ অবস্থাই বিরাজ করছে। আমাদের বাড়ীতে, স্কুলে আর জনজীবনে আজ এমন সব ব্যাপার ঘটে চলেছে যা সুস্থ ও শক্ত পৌরুষ আর নারীত্ব গড়ে উঠার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে সব পাপ বা নীচতা, হয়তো অল্প বিস্তর সব সমাজেই দেখতে পাওয়া যায় এখানে আমরা তার প্রতি ইংগিত করছিনা। যদিও আমরা চাই সব সমাজ

থেকেই এসব বিদূরিত হোক। শিক্ষা সফলতা ইত্যাদির প্রতি মানুষের যে সাধারণ মনোভাব তার কথাই আমরা বলতে চাচ্ছি এখানে। এখন যে অভাব অনটন আর অর্থনৈতিক সংকট চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শেষোক্ত ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত নিন্দা আমরা করতে চাইনা। পার্থিব বস্তুকে আমরা চাইনা তেমন অবহেলা করতে। কিন্তু ইদানীং পার্থিব সাফল্যের ব্যাপারে এতবেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যে যার ফলে আমাদের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বোধে নেমে এসেছে বিকৃতি। এমনকি নৈতিকতায় বিশ্বাসী পিতা মাতাও এমন যে পড়াশুনা আয়ত্ব করলে জীবনে 'সফলতা' আসবে তা অর্জনেই উৎসাহিত করে থাকেন বেশী। বলাবাহুল্য 'সফলতা' মানে এদের কাছে অর্থ আর পদমর্যাদা বেশী ইত্যাদি। ছেলে মেয়েদের বলা হয় আগে 'সফল' হও—পারো যদি পরে 'ভালো মানুষ' হয়ো। তেমন পেশাগত শিক্ষা দিচ্ছেনা বলে আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির নিন্দা করে থাকি অহরহ। শিক্ষিত অশিক্ষিত আমরা কেউই দারিদ্র পছন্দ করিনা। সে হিসেবে এ সমালোচনা একেবারে নিরর্থক নয়। কিন্তু ভুল হচ্ছে এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের ছেলেমেয়েদের কিছুমাত্র নৈতিক মানুষ গড়ে তুলছে কিনা এ সম্বন্ধে আমাদের কোন আগ্রহই নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছেলেমেয়েদের উপর কোন নৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে কিনা তা এখন কিছুমাত্র বিবেচনার মধ্যেই আনা—হয়না স্রেফ 'পাশের' সংখ্যা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালো আর মন্দে ভাগ করা হয়। শিক্ষক নিয়োগের সময় ছেলেদের নৈতিক শিক্ষার দিকটা মোটেই পায় না আমল। পিতামাতা নির্বাচনে ছেলে মেয়েদের হাত নেই সত্য, কিন্তু শিক্ষক নিয়োগত এমন কপাল নির্ভর ব্যাপার নয়। শিক্ষক নিয়োগের সময় শিশুর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন নেই জানি কিন্তু তার অধিকার, প্রয়োজন ও চাহিদার কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? শিক্ষকের নিজের জীবন ছাত্রের অনুকরণযোগ্য হওয়া চাই। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় এর বিপরীতই ঘটে। পিতা-মাতা অভিভাবক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ কেউই এ বিষয়ে কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেন না। ফলে যে সব লোকের কোন রকম নৈতিকবোধ নেই বা নেই নৈতিক বিধি বিধানের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা—যাদের সংসর্গ চরিত্র গঠনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারাই নির্বাচিত হন শিক্ষক।

বাড়ী বা স্কুলের বাইরে সামাজিক আবহাওয়া ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করেনা। চারদিকের সমাজের পছন্দ অপ-

ছন্দকেও অতি সহজে তরুণ মনকে করে থাকে প্রভাবিত। যে সমাজ সৎ-গুণের উপর সফলতাকে, নীতির উপর কলা-কৌশল বা সততার উপর চালাকিকে স্থান দেয় আর হয় সেসবের প্রশংসায় মুখর সে সমাজে সাধুতা, সত্য আর ন্যায় প্রীতি এবং অন্য সব নৈতিক গুণের চর্চা কিছুতেই আশা করা যায় না। এখন এ অবস্থা চলতে থাকলে বা চলতে দিলে জাতির নৈতিক ভবিষ্যত কিছুতেই রক্ষিত হবে না। সমাজ ও জনজীবনের নেতৃবর্গের এ কথাটা স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক।

মওলানা আকরম খাঁ'র শেষ দুটি সম্পাদকীয়

আজকালকার রাজনীতি

সোমবার, ৭ই ফাল্‌গুন ১৩৭৩। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশসমূহে এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির সর্বত্রই দেশের শাসন পরিচালনার জন্য কোন না কোন প্রকারের আইন-কানুনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে গুরুশ্রাব্য শব্দ ও সমাসের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের মঙ্গল ও মুক্তিসাধনের সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, বাস্তব ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যগুলির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

দেশ বলিতে দেশের অধিবাসী সমস্ত মানুষকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু আজ দেশ বলিতে দেশের কতিপয় ধনিক-বণিককে মাত্র বুঝাইয়া থাকে। ইহার ফলে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে নানা উপদ্রব ও উচ্ছৃংখলতার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে। আমাদের সর্বনিকটবর্তী ভারতের দিকে তাকাইয়া দেখ, কাগজে কলমে আইনের শাসন দৃঢ়তার সহিত চালু হইয়া আছে, কিন্তু শান্তি কোঁথায় সুশৃংখলা কোথায়? ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আইনের শাসন প্রচলিত করিতে পালন পর্যবেক্ষণ বলিয়া যেসব গুলি আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহা তামাদি দোষে বারিত হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর উৎপাত ও অনাচারের প্রধান কারণ এই যে মানুষ সমাজ সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম প্রভুত্ব ও আধিপত্যের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

পাপপূণ্য বলিয়া কর্তব্য অপরিহার্য বলিয়া সর্ববিষয় কর্মে নিজের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে শেষ কথা ও একমাত্র কথা বলিয়া ধরিয়াছে। তাই তাহারা আইন রচনা করা ও লংঘন করার সময় ন্যায়-অন্যায়, সততার বা অসাধুতার বিচার তাহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। মোটের উপর কথা এই যে, রাজনৈতিক ব্যাপারগুলিতেও স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। অথচ বস্তুতঃ আইন-কানুনের সর্বপ্রধান উৎস হইতেছে ধর্ম। যেখানে দ্বীন-ধর্মের কোন সংস্রব নাই, সেখানে সুষ্ঠু রাজনীতির স্থান নাই।

ভারতের মোসলেম প্রতিষ্ঠান

৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৩। পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জ্ঞান গবেষণায় ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিভিন্ন দিক হইতে যে

সব আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, শুদ্ধি ও সংগঠন নামে একটি উদ্ভট ও উৎকট ব্যাপক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মোসলেম জাতি ও ইসলাম ধর্মের সব কিছুই যে সম্পূর্ণ অসার, সব কিছুই যে অনন্য, এই ধরনের প্রচার চালাইয়া মুসলমান জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলাই ছিল এই অনাচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই অসাধু প্রচেষ্টা সফল করার জন্য প্রথমে হিন্দু সুধীসজ্জনগণ কর্মক্ষেত্ররূপে অবলম্বন করিলেন বাংলা ভাষাকে এবং প্রদেশের ইতিহাসকে। বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণ ও বিজয় সমস্ত মিথ্যা, মীর নেসার আলীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাহারা ঠাট্টা-তামাসায় রূপ দিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং এইসব বড় বড় ব্যাপার ছাড়াও তাহারা বাংলাদেশের মোসলেম কীর্তিগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। এই অপচেষ্টার ফলে বাংলার সরফরাজপুর স্বর্গরাজপুর হইয়া গেল। মোমেনশাহী পরগণা ময়মনসিংহ, বশীহরহাট বসুরহাটে, দুর্গপুর দুর্গাপুরে, মাদানীপুর মেদিনীপুরে এবং সদাসর্বদা মুষলধারণ করিয়া বেড়ানোর জন্য মুসলমান মুষলমানে পরিণত হইয়া গেল। এবং এই ব্যাকরণের সাহায্যে শত শত আরবী ফার্সি শব্দ নিখুঁত সংস্কৃত শব্দে পরিণত হইয়া গেল।

দুঃখের বিষয়, আজ এই অনাচার নিবৃত্তি হইতে পারে নাই। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতের জনৈক ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া মুসলমান বাদশাহর প্রতিষ্ঠিত কুতুব মিনারকে কোন একজন অমুসলমানের কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাজমহল শাহজাহানের প্রতিষ্ঠিত নহে। ব্যাকরণের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দুইটি হিন্দু নামের সন্ধান করা হইতেছে কিনা, তাহা এখনো জানা যায় নাই। এই আশঙ্কা যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা বলা যায় না। কারণ, হিন্দু পণ্ডিতগণের অঘটন সংঘটন প্রতিভার এইরূপ যথেষ্ট নজীর বিদ্যমান আছে। ইহার একটা উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃতি করিয়া দিতেছি :—

মুসলিম জাতির ইতিহাসে বাগদাদ শহরের মর্যাদা যে কত তাহা সকলের জানা আছে। জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত বাগদাদ শহরকে হিন্দু প্রতিষ্ঠানরূপে প্রমাণ করার জন্য প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাগদাদ নামটাই সংস্কৃত যথা : বঃ ইতি বলঃ ঘ গদাঃ ইতি দমুগরঃ দঃ ইতি দদাতিষঃ অর্থাৎ বলপূর্বক গদা। দ-দাদা-তিষস বাগদাদ। (কলিকাতার বিখ্যাত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

আবুল কালাম শামসুদ্দিনের প্রবন্ধ থেকে

সাহিত্যে মনন

"জীবনের গতিধারা ও তার বিকাশের রূপায়নই হচ্ছে সাহিত্যের বিষয়বস্তু। জীবনের গতিধারা ও তার বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় অনুভূতি ও মননশীলতায়। অনুভূতি হচ্ছে সর্বজনীন। কাজেই সাহিত্যে যা চিরন্তন, তা হচ্ছে অনুভূতির দান। কিন্তু চিরন্তন ছাড়াও সাহিত্যের একটা দৈশিক ও কালিক রূপ আছে। সেখানেই মননশীলতার অধিকার।

সাহিত্যক্ষেত্রে অনুভূতি ও মননশীলতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। অনুভূতিহীন মননশীল সাহিত্য নিরস ; আবার মননের সম্পর্কহীন অনুভূতিপ্রধান সাহিত্য নিতান্তই পান্‌সে, জলোধরনের—এর কোনটাই সত্যিকার সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কারণ রসের উৎস অনুভূতি ; এই উৎস থেকে নিঃসৃত রসধারার উপযুক্ত পরিশোধনাগার হচ্ছে মনন। তাই অনুভূতি ও রসের মতো মননও সাহিত্যে অপরিহার্য। অনুভূতি ও রসের ক্ষেত্রে সাহিত্য স্থান-কালের বালাই নাই বটে, কিন্তু মননের ক্ষেত্রে সাহিত্যে তা অপরিহার্য। কারণ, স্থান-কাল-পাত্রের দাবীই সেখানে বড় কথা। এবং সে হচ্ছে বুদ্ধির ব্যাপার।

স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলেই বুদ্ধি বিকাশশীল। বুদ্ধির এই বিকাশশীলতাই যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্যের নব-রূপায়ন নিয়ে এসেছে। কাজেই সাহিত্যের নবরূপায়নের মূলে আছে মনন।" (১৩৫১)

রেনেসাঁর কথা

"মনের মুক্তি হচ্ছে রেনেসাঁর ব্যাপার। জাতির চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটনের নামই রেনেসাঁ। অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম রেনেসাঁ নয়, আবার অতীতকে সমূলে বর্জন করার কল্পনাও রেনেসাঁর নেই। অতীতের যা ভালো ও স্থায়ী, তা-ই নিঃসন্দেহে রেনেসাঁর ভিত্তিভূমি। অতীতের এই ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁ ভবিষ্যৎকে বরণ করে। তাই রেনেসাঁ মানুষের চিন্তারাজ্যের বিপ্লব।

জাতির রাজনৈতিক মুক্তিই সর্বাঙ্গীন জাতীয় আজাদী নয়। কাজেই জাতির রাজনৈতিক মনের মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নির্দেশই রেনেসাঁর একমাত্র

কাজ নয়। তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, শৈক্ষিক মুক্তি না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনো জাতি সত্যিকার আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনেসাঁ তার সাহিত্য, তমদ্দুন, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে জাতিকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে।

তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এদেশের অধিবাসীর স্বকীয় বিশিষ্টতাকে খুঁজে বার করতে হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পলাশীর বিপর্যয়ে জাতি হিসাবে জীবনমৃত হয়ে পড়ার ফলে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তামদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলেছিলাম আমাদের শিক্ষানীতির গণতান্ত্রিক এবং অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির বিশিষ্টতার কথা। এ-সব ক্ষেত্রেও আমরা স্বকীয়তা হারিয়ে অনুকরণের বাঁদরে পরিণত হয়েছিলাম। কাজেই রেনেসাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে এ বাঁদরত্ব ঘোচাতে হবে।" (১৯৪৩)

সংস্কৃতি

"চিন্তাধারা, বিশ্বাস, আচার-আচরণের প্রতিফলনের ফলে মানুষের জীবনের বিশিষ্ট রূপায়নকেই সাধারণতঃ বলা হয় তার সংস্কৃতি বা তমদ্দুন। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, এই কারণে সমাজবদ্ধ জনসমবায়ের ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবও তার ব্যক্তি-জীবনের রূপায়নে রেখাপাত করে। কিন্তু তমদ্দুন বা সংস্কৃতির সে রেখাপাত যতটা ব্যক্তি-জীবনে লক্ষ্যযোগ্য, তার চাইতে বেশী এর প্রকাশ-ক্ষেত্র হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীবন। ফলতঃ সমাজই হচ্ছে সত্যিকারভাবে তমদ্দুনের বিকাশ ও প্রকাশ-ক্ষেত্র। কারণ মানুষ ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় সমাজক্ষেত্রেই এবং সেখানেই তার একটা একক বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠে। সামাজিক জীবনের এই একক বিশিষ্ট রূপই হচ্ছে তার তমদ্দুন।

দৈশিক সীমাবদ্ধতায়ও সে দেশের মানুষের একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠতে পারে, যদি সে-দেশের মানুষের মধ্যে একটা সামাজিক ঐক্যবোধ গড়ে উঠা সম্ভব হয়ে উঠে। এই সামাজিক ঐক্যবোধ যেসব উপাদান উপকরণের উপর সাধারণতঃ নির্ভরশীল, সে-সব হচ্ছে প্রধানতঃ আচার-আচরণ, সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস, আহার-বিহার ইত্যাদি। দেশের সমস্ত লোকের সামাজিক জীবন যেখানে এইসব উপাদান-উপকরণের ভিত্তিতে ঐক্য

বদ্ধ, সেখানেই মাত্র দৈশিক তমদ্দুন বা সংস্কৃতির উদ্ভব সম্ভব। কিন্তু সেখানকার মানুষের জীবন-প্রবাহে এদের অধিকাংশের ভিত্তি অস্বীকৃত, সেখানে দৈশিক সংস্কৃতি কল্পকথা মাত্র, তা বাস্তব সত্য নয়—হতে পারেনা।" (১৩৭৩)

সংবাদ-সাহিত্য

"সংবাদ-সাহিত্য বা জার্নালিজমের প্রভাব এখন দুনিয়ার বৃহত্তর সাহিত্য-ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী। এই প্রভাব কিছুটা অগভীর ও অস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু মানব-সমাজকে এত ব্যাপকভাবে নাড়া দেবার শক্তি সাহিত্যের অন্য কোনো শাখারই নাই। যে-সাহিত্য মানব-সমাজের উপর এমন ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল, সে-সাহিত্য নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়।

মানব-সমাজের ভাঙা-গড়ার ব্যাপারে যে-সব আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে, সংবাদ-সাহিত্যই তার শ্রেষ্ঠ বাহন। সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংবাদ-সাহিত্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখন দুনিয়া ও মানুষ সম্পর্কে আগ্রহশীল মাত্রেরই একে বাদ দিয়ে একপদ অগ্রসর হওয়ারও উপায় নাই। দেশ, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির উন্নতি, সংস্কার, পরিবর্তনের পরিচয় এখন একান্তভাবেই সংবাদ-সাহিত্য সাপেক্ষ। সংবাদ-সাহিত্যের প্রচারফলে এখন দল ভাঙে-গড়ে, নেতৃত্বের হয় উত্থান-পতন, দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের প্রবক্তাদের কথা সর্বত্র প্রসার লাভ করে এমন কি, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও পতনও এর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কাজেই একে যে বলা হয় চতুর্থ শক্তি (Fourth State), তা অযথার্থ নয়।" (১৯৪২)

সাংবাদিকতা ও রাষ্ট্র

"সংবাদপত্রকে চতুর্থ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, রাষ্ট্রের সুপরিচালন ও সুনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সংবাদপত্রের দায়িত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রের পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণের উপর সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ হাত নাই বটে, কিন্তু যারা সে ব্যাপারে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত, সংবাদপত্র তাঁদের কাজকে প্রভাবিত করতে পারে যুক্তিসহ সুপরামর্শ দিয়ে। এই জায়গায়ই সংবাদপত্রের দায়িত্বের কথা উঠে। সংবাদপত্র যদি তার এই দায়িত্ব সুবিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পালন করতে পারে তবে যারা রাষ্ট্রের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত, তারা উপকৃত হতে পারেন। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রের পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁরা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনও করতে পারেন। কাজেই, প্রত্যক্ষভাবে না-হলেও

রাষ্ট্রের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে যে সংবাদপত্রের প্রভাব অনেকখানিই তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে সংবাদপত্র যদি সম্যক সচেতন না থাকে, যদি সংবাদপত্র ব্যক্তি-বিশেষের, বা সস্তা উশৃঙ্খল জনমতের দ্বারা পরিচালিত হয়, কিংবা জাতির ভালোমন্দ ও সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রের কর্তব্য কি হতে পারে, সে বিষয়ে কোনো চিন্তা না করেই নিজের খোশ-খেয়ালে চালিত হয়, তবে সে সংবাদপত্র শুধু যে তার উপর অর্পিত দায়িত্বেরই অবমাননা করে তা নয়, তার অস্তিত্ব তখন রাষ্ট্র এবং জাতিরও ক্ষতির কারণ হয়ে উঠে। কাজেই সংবাদপত্রের কাজে নিযুক্ত সাংবাদিকদের উপর বিরাট দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত এ বোধ পুরোপুরিভাবে সাংবাদিকদের না থাকলে সংবাদ পত্র সেবা তাঁর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে হয়ে উঠতে পারেনা। রাষ্ট্র ও জাতির মঙ্গল চিন্তাই যে সাংবাদিক জীবনের প্রধান উপজীব্য এ সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা না থাকলে কেউ দায়িত্বশীল সাংবাদিক হতে পারেন না। বর্তমান গণতান্ত্রিকতার যুগে জাতীয় জীবনে জনমতের স্থান খুবই উচ্চে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জনমতের গড্ডালিকা-প্রবাহে সাংবাদিকের সব সময় ভেসে যাওয়া চলেনা। জনমতকে রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণের পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করাই সাংবাদিকের প্রধান কর্তব্য। কাজেই জনমতের ঠিক অনুসরণ নয়, তাকে সুবিবেচিত কল্যাণের পথে পরিচালনার নির্দেশই সাংবাদিক প্রদান করেন। এ-কথা ঠিক যে, জাতি ও রাষ্ট্রের মঙ্গল-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এবং গণতন্ত্রে শ্রদ্ধাবান সাংবাদিক কখনো জনমতের প্রতি উপেক্ষাশীল হতে পারেন না—জনমতের প্রকাশ-ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত হতে দেয়াও সাংবাদিকের কাজ নয়। কিন্তু জনমত সবসময় সুস্থ না-ও হতে পারে, এমন কি, সময় সময় তা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। তেমন অবস্থায়, রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণকামী সাংবাদিক কখনো সে জনমতকে সমর্থন দিতে পারেন না। সে জনমতের ভুল-ভ্রান্তি ও অনিষ্টকর সম্ভাবনার কথা যুক্তিপূর্ণ সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করতে হবে। সুস্থ জনমতের সমর্থন এবং অসুস্থ জনমতের যুক্তিসহ সমালোচনাই সত্যকার সাংবাদিকের কর্মনীতি।

ঠিক একই কারণে রাষ্ট্রের কাজে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকলাপও সাংবাদিকের সমালোচনার বিষয়ীভূত। রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণই যেহেতু সাংবাদিকের মূল লক্ষ্য,

তাই সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ রাষ্ট্র ও জাতির সত্যকার কল্যাণভিসারী কিনা, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা সাংবাদিকের পরম কর্তব্য বৈকি। এমনকি, যিনি রাষ্ট্রের কর্ণধারের আসনে উপবিষ্ট, তিনিও ভুলভ্রান্তির অতীত নন; তাঁর কাজের সমালোচনা করার অধিকারও সাংবাদিকের আছে, সন্দেহ নাই। তবে এসব সমালোচনা করার সময়ে সাংবাদিককে লক্ষ্য রাখতে হবে, তার অভিমত সাংবাদিকের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণভিত্তিক কিনা।

রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণভিত্তিক যে-সমালোচনা, তা থেকে সাংবাদিককে নিরস্ত করার অধিকার কারুর নাই। কেউ যদি 'অধিকারের' নামে সে সম্পর্কে কোনরূপ বিধিনিষেধ সাংবাদিকের উপর জারী করেন, তবে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক কখনো তার নিকট নতিস্বীকার করতে পারেন না।

তবে রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণভিত্তিক সমালোচনার অবাধ অধিকার সাংবাদিকের থাকলেও সে সমালোচনা সব সময়ে গঠনমূলক হওয়াই উচিত। কারণ, আক্রমণমূলক সমালোচনায় কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই হয় বেশী। কারণ আক্রমণমূলক সমালোচনায় আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বিতীয় রিপুর উত্তেজনাকেই বাড়িয়ে দেওয়া হয় মাত্র, তাঁর ভুলত্রুটির সংশোধনে তাঁকে সাহায্য করা হয় না। ফলে সমালোচনার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই কারণে দায়িত্বশীল সাংবাদিক এই শ্রেণীর সমালোচনাকে সাংবাদিক-অধিকার ও কর্তব্যের অপব্যবহার বলেই মনে করেন।

রাষ্ট্রের কাজে যাঁরা নিযুক্ত, তাঁরা যাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বপালন করে যেতে পারেন, সে সম্পর্কে তাঁদেরকে সুবিবেচিত পরামর্শ দেওয়া সাংবাদিকের অন্যতম প্রধান কাজ। জাতিকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে সরকারের ভালো কাজে সহযোগিতা করার জন্য। তা'ছাড়া রাষ্ট্রের যারা দুশমন, জাতির ক্ষতিকর কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের মুখোশ খুলে ফেলা-ও সাংবাদিকের একটা বড় দায়িত্ব। কারণ রাষ্ট্র-বিরোধিতার কাজে যারা নেমেছে, তাদের মুখোশ যথাসময়ে খুলে না ধরলে তাদের দ্বারা রাষ্ট্র ও জাতির যে ক্ষতি হবে, তার ভাবী ফল রাষ্ট্র ও জাতির জন্য ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। যথাসময়ে ওদের স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরলে রাষ্ট্র ও জাতি সে-বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। এই কারণে সত্যকার সাংবাদিক এ অপ্রীতিকর কর্তব্য পালনের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।" (১৯৫১)

উন্নয়ন ও সাংবাদিকতা

জনমতকে রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণের পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং জনশক্তিকে দেশ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলা সাংবাদিকদের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সংবাদপত্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব বলতে বোঝায় সাংবাদিকদের সম্মিলিত ভূমিকা ও দায়িত্বের যোগফল। সুষ্ঠুভাবে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের সেবা, দেশ ও জাতির খেদমত করার জন্য দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্য সচেতনতাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য এই বিশেষ পেশার জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার দরকার। সংবাদপত্র সেবার মাধ্যমে সাংবাদিকতা বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য আছে।

সুষ্ঠু সাংবাদিকতা, উন্নতমানের সংবাদপত্র পরিচালনা, দেশ ও জাতি গঠন এবং উন্নয়ন যা-ই বলি না কেন, ফোর্থ এজেন্ট অর্থাৎ শক্তিশালী গণসংযোগ ও প্রচার মাধ্যম সংবাদপত্রসেবীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অপরিহার্য। সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির যুগেও বর্তমানে জ্ঞানের এলাকা ও দিগন্ত অনেক প্রসারিত হয়েছে। সুষ্ঠু ও উন্নতমানের সাংবাদিকতা, সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দরকার বিভিন্ন বিষয়ে যথাসম্ভব নির্ভুল ও গভীর জ্ঞান অর্জন। উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস-ভূগোল, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সব কিছুই জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পৃক্ত। সুষ্ঠু ও সার্থক সাংবাদিকতার জন্যে সব বিষয়েই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন দরকার। (১৯৭৮)

আবুল মনসুর আহমদ

প্রস্তাবিত জুট ইন্টারন্যাশনালের উভয় দিক দেখিতে হইবে

কারো সংগে কোনও বিতর্কে নামার ইচ্ছা আমার নাই। শক্তিও নাই। সরকারের সংগেত নয়ই। তথ্য ও মতবাদ উভয় দিক হইতেই এমন বিতর্ক অর্থহীন। মতবাদের দিক হইতে নিরর্থক। তথ্যের দিক হইতে ভিত্তিহীন। সরকারের কাছে ব্যক্তির মতবাদের কোন দাম নাই। আর তথ্যের দিক হইতে ব্যক্তির চেয়ে সরকার অনেক বেশী জ্ঞানী।

এ অবস্থায় আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, সরকারের পাট দফতরের সাথে নাহক আমার একটা বিতর্ক বাধিয়া গিয়াছে। পাট দফতর নাহক ও অনাবশ্যকভাবে এই বিতর্ক বাধাইয়াছেন, এ কথা বলিলে আরেকটা নয়া বিতর্ক আনা হয়। তাই ও কথা আমি বলিব না। বস্তুতঃ এই বিতর্কেই আমি থাকিতাম না যদি এতে জুট ইন্টারন্যাশনাল-এর মত একটা গুরুত্বপূর্ণ সুদূরপ্রসারী বিষয় জড়িত না থাকিত। প্রশ্নটা সত্য সত্যই এমন একটা ব্যাপার যার উপর বিশেষজ্ঞ স্তরে আলোচনা এবং রাজনৈতিক স্তরে সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। শুধু অফিসার স্তরের আলোচনায় এমন ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাইতে পারে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এ আলোচনায় যোগ দিলাম। সরকারী হ্যাণ্ড আউটের সমালোচনা করিলাম নিতান্ত প্রসংগক্রমেই।

গত ২৪শে আগষ্ট 'ইত্তেফাকে' পাট সম্পর্কে আমি যে নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম, 'তার প্রতি অর্থ ও পাট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে'। সরকারের তরফ হইতে বলা হইয়াছেঃ 'নিবন্ধে কতিপয় মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হইলেও ইহাতে কিছু তথ্যগত ভুল রহিয়াছে। প্রথমেই 'কতিপয় মূল্যবান পরামর্শের' স্বীকৃতির জন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এবং 'কতিপয় তথ্যগত ত্রুটির' জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইতেছি। 'কতিপয় ত্রুটির' মধ্যে সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই হইয়াছে যে, আমি হিসাবের ভুল করিয়াছি। প্রতি কুইন্টালের দাম একশত সাতানু হইলে মণের দাম কত? অংকশাস্ত্রে আমি ছাত্রজীবনেই কাঁচা ছিলাম। এখন বুড়া বয়সে ত কথাই নাই। তার উপর পাটের কুইন্টাল আসলে কত মণ, তাও আমার নিখুঁতভাবে জানা ছিলনা। সেই অজ্ঞতার দরুণ আমি বলিয়াছিলাম

কুইন্টালের দাম একশ সাতান্ন হইলে মণে হয় সত্তর টাকা। এটা সাংঘাতিক ভুল। প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক বেশী। ভাগ্যিস আমি পাট বেচি নাই, পাট দফতরও কিনেন নাই। এটা যদি ঘটিত, তবে পাট দফতর ভয়ানক ঠকিতেন। আর আমি ঠকপ্রবঞ্চক বলিয়া ধরা পড়িতাম। কারণ সরকারী মতে যেখানে দাম মাত্র ‘সাতান্ন টাকার সামান্য বেশী’ আমি সেখানে দাবী করিয়াছি সত্তর টাকা। মণ-প্রতি তের টাকাই বেশী। একেবারে দিনে ডাকাতি। তথাপি সরকারি হিসাবটা যদি ঠিক হইত, তবে আমি খুশীই হইতাম। ভবিষ্যতে আমার বা আমার মত আর কারও ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাট-বিভাগে যিনি আলোচ্য হ্যাণ্ড আউট মুসাবিদা করিয়াছেন, তিনিও পাটের হিসাবে আমার চেয়ে খুব বেশী পাকা নন। তিনি প্রতি কুইন্টেলকে দুই মণ ত্রিশ সের ধরিয়াছেন।

আসলে প্রতি কুইন্টেল দুই মণ সাড়ে ছাব্বিশ সেরের সমান। দশমিক হিসাব মতে ধরা হয় দুই পয়েন্ট সাত মণ। হিসাবে মণকরা পাটের হয় আটান্ন টাকা পনর পয়সার সামান্য কম। কাজেই পাট দফতরের এই অফিসারটি মণ-প্রতি এক টাকা কম ধরিয়াছেন। বাংলাদেশ ভারতের নিকট পাট বিক্রয়ের চুক্তি করিয়াছে। এ অফিসার সাহেবের হিসাব মত ভারতের নিকট হইতে দাম গ্রহণ করিলে বাংলাদেশের অনেক টাকা লোকসান হইবে। ‘পাট মন্ত্রণালয়’ সাবধান। আমার মত রাস্তার মানুষের ভুলে কিছু আসে যায় না। সরকারী কর্মচারীর ভুলে অনেক আসে যায়।

আমার এই অংকশাস্ত্রের ভুল ছাড়া পাট দফতর আমার আর কি কি ভুল ধরিয়াছেন, এখন তার আলোচনা করা হউক। আমি আমার নিবন্ধে লিখিয়াছিলাম: ‘গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরে একটি আন্তর্জাতিক গোপন সম্মিলনী হইয়াছিল’। পাট দফতরের হ্যাণ্ড আউটে এই ‘গোপন’ কথাটিতেই আপত্তি করিয়াছেন। ‘গোপন’ কথাটি কোন খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। সভা-সম্মিলনীতে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের প্রবেশাধিকার না থাকিলেই তাকে ‘গোপন’ মানে, ‘নট অপেন টু দি প্রেস’ বলা হয়। এটা কোন অসাধারণ ব্যাপার নয়। সভা-সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের ইচ্ছামতই এটা করা হয়। তা করিবার ন্যায়সংগত অধিকারও উদ্যোক্তাদের আছে। এমন সভা-সম্মিলনীকে ‘গোপন’ বলাই রেওয়াজ। আলোচ্য পাট সম্মিলনী যে ‘গোপন’ হইয়াছিল এবং তাতে যে সংবাদপত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না, তার বড় প্রমাণ এই যে, সম্মিলনীশেষে সম্মিলনীর সভাপতি এক

প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়াছিলেন এবং তাতেই সম্মিলনীর সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আমার লেখায় উল্লেখিত গোপন কথাটার কদর্য করিয়া পাট দফতর এতই গোস্বা হইয়াছেন যে, আমার নিবন্ধের আসল ভুলটার প্রতিবাদ করিতেই তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আসল ব্যাপার এই যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় 'গোপন' বা 'প্রকাশ্য' কোন পাট সম্মিলনীই হয় নাই। আলোচ্য সম্মিলনীটা হইয়াছিল জানুয়ারী মাসে। জানুয়ারীর ১৫ই হইতে ১৯শে পর্যন্ত পাঁচদিন ধরিয়া এই বৈঠক চলিয়াছিল। ১৯শে জানুয়ারী সম্মিলনী শেষে সম্মিলনীর সভাপতি একটি প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়া সম্মিলনীর সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করেন। ২০শে জানুয়ারীর খবরের কাগজসমূহে ঐ প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্ট পড়িয়াই দেশবাসী সর্বপ্রথম জানিতে পারে যে, ঐ সম্মিলনীতে একটি 'জুট ইন্টারন্যাশনাল' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং সে জুট ইন্টারন্যাশনালের হেড অফিস স্থাপিত হইবে নয়াদিল্লীতে। দেশবাসী এ সম্পর্কে এর বেশী কিছু জানিতে পারে নাই।

তারপর ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইতালির রোম শহর হইতে ঢাকা সম্মিলনীর বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এতদিন পরে সুদূর বিদেশ হইতে ঐ বিবরণী বাহির হইয়াছিল বলিয়া নিউজ এজেন্সীরা বোধ হয় তেমন বিস্তারিত রিপোর্টও প্রচার করেন নাই। করিয়া থাকিলেও আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহ স্বভাবতঃই ঐ বাসি খবর প্রচারে তেমন উৎসাহ বোধ করে নাই। ফলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাট সম্মিলনীর 'গোপন' বৈঠকের কার্য বিবরণী বাংলাদেশবাসীর কাছে 'গোপন'ই রহিয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় 'গোপন' শব্দটার ব্যবহারে আমাদের কারও উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আমি আমার আলোচ্য নিবন্ধে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক, জুট মিনিষ্ট্রি স্থাপন না করিয়া জুট ডিভিশন সৃষ্টি করা। দুই, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য পঞ্চাশ টাকা ধার্য করা। তিন, জুট ইন্টারন্যাশনাল-এর হেড অফিস নয়াদিল্লীতে স্থাপন করায় রাজী হওয়া। পাট দফতরের আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে: 'সরকার ইতিমধ্যেই নীতিগতভাবে এ সংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।' এটা একটা খোশখবর। বস্তুতঃ আমার আলোচ্য নিবন্ধের আপত্তি অর্ধেক

এই কথাতেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আমি ঐ নিবন্ধে বলিয়াছি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করি এবং বহুদিন হইতে বলিয়াও আসিতেছি যে, পাট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জুট মিনিস্ট্রি গঠন করিতে হইবে। সে মিনিস্ট্রির দায়িত্ব এককভাবে একজন মন্ত্রীর হাতেই দেওয়া হইবে, কি অন্য কোনও মিনিস্ট্রির সাথে একই মন্ত্রীর হেফাযতে দেওয়া হইবে, সেটা প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর যোগ্যতা ও দক্ষতার উপরই সেটা নির্ভর করিবে। বস্তুতঃ যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার বিচারেই একই মন্ত্রীর কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের ভার দেওয়া হইয়া থাকে। জুট মিনিস্ট্রির দায়িত্বও সেই বিচারেই বর্তমান অর্থমন্ত্রী বা যে কোন মন্ত্রীকে দেওয়া যাইতে পারে। আসল প্রশ্ন, এটা মিনিস্ট্রি, না ডিভিশন? মন্ত্রণালয়, না বিভাগ? এ সম্পর্কে আমাদের সরকারের সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া মনে হইল না। আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটটিকে "অর্থ ও পাট মন্ত্রণালয়ের পাট বিভাগ হইতে প্রদত্ত হ্যাণ্ড আউট" বলা হইয়াছে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাট মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। এই হ্যাণ্ড আউটের আরো একাধিক জায়গায় 'পাট মন্ত্রণালয়ের পাট বিভাগ' কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় 'সরকার একটি পাট মন্ত্রণালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছে', এ কথার কোনও অর্থ হয় না। সে যাই হউক সরকার যদি ইতিমধ্যে একটি পাট মন্ত্রণালয় স্থাপন করিয়া ফেলিয়া থাকেন, তবে এ সংক্রান্ত আমার 'মূল্যবান পরামর্শ' গ্রহণ করিয়াই ফেলিয়াছেন। আমার আপত্তির বড় একটা কারণ দূর হইয়া গিয়াছে। একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের অভাবেই যে জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশনে অব্যবস্থা চলিতেছিল, এবং সে অব্যবস্থার দরুণই যে রপ্তানীর ব্যাপারে বিদেশী খরিদ্দারদের সাথে চুক্তি-ভংগ ঘটিয়াছিল, মন্ত্রণালয় স্থাপনের পর আশা করি তেমন একটিও গাফলতি আর হইবে না। তবে আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটে রপ্তানি কর্পোরেশন-এর সুস্পষ্ট ত্রুটি-গাফলতিকে যেভাবে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, সেটাও সরকারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। আলোচ্য হ্যাণ্ড আউটে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৭২-৭৩ সালে ৩০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী করার কথা ছিল। কর্পোরেশন সে স্থলে ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার বেল রপ্তানী করিয়াছে। এই প্রায় দুই লক্ষ বেল কম রপ্তানি করাতেও আমাদের নাকি কোন লোকসান

হয় নাই। হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে, ৩০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী করিয়া একশ' কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জনের কথা ছিল সে স্থলে কর্পোরেশন ২৮ লক্ষ বেল রপ্তানী করিয়াই ১০৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা অর্জন করিয়াছে। 'লাভ-লোকসানের' ধারণা যদি আমাদের পাট দফতরের এমন হয়, তবে ত বিপদের কথা। যাহোক, ভবিষ্যতে বিদেশী বাজারে পাটের দাম বাড়িয়া গেলে কম পাট রপ্তানি করিয়া এমন 'লাভ' যাতে আমাদের পাট রপ্তানী কর্পোরেশন আর না করেন, সেদিকে মন্ত্রণালয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

তারপর থাকিল পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটা। সরকারী হ্যাণ্ড আউটে আমার হিসাবের ভুল দেখাইতে যত শক্তি ব্যয় করা হইয়াছে, আমাদের পাট পাচারের প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিকে তত শক্তি ব্যয় করা হয় নাই। বস্তুতঃ ভারতে পাটের দাম ৫৭/৫৮ টাকা হইলেও আমাদের টাকায় তার দাম ১১৪ কি ১১৬ টাকা। সে দাম যে আমাদের পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশী এবং তা যে স্মাগলিং-এর উস্কানি দিতে পারে, সরকার সে বিপদের বিচার করেন নাই। চোরাচালানই যে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো চুরমার করিয়া ফেলিতেছে, সম্প্রতি আমাদের ষ্টেট ব্যাংকের গভর্ণরও সে কথা বলিয়াছেন। আমাদের নির্ধারিত দামটা যে পাটের চোরাচালানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎসাহ যোগাইবে, সরকারী হ্যাণ্ড আউটে সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয় নাই। এ সম্পর্কে বিলাতী পাট খরিদ্দারের কলিকাতার বাজার হইতে বাংলাদেশের পাট খরিদের কথাটাকে হ্যাণ্ড আউটে ভিত্তিহীন গুজব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী ধারণাই সত্য হউক। কিন্তু বর্ডার-প্যাক্ট চালু থাকাবস্থায় চোরাচালানের সমস্ত অভিযোগকেও সরকার ভিত্তিহীন গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐসব অভিযোগের 'ভিত্তি' পাওয়া যাওয়ায় সরকার অবশেষে বর্ডার প্যাক্ট বাতিল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বিলাতী খরিদ্দারের কলিকাতায় পাট কিনিবার "গুজবটা"র অবস্থাও তাই না হয়, সেদিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। কলিকাতার বাজারে বাংলাদেশের পাট বিক্রির 'গুজবের' সাথে আমি চামড়া কিনার 'গুজবের' কথাও বলিয়াছিলাম। চামড়াটা পাট দফতরের এলাকায় পড়ে না বলিয়াই বোধ হয় হ্যাণ্ড আউটে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট দফতরকে দিয়া তারও একটা প্রতিবাদের ব্যবস্থা করিবেন কি?

এইবার জুট ইন্টারন্যাশনালের কথাটায় আসা যাক। আমাদের জুট বিভাগের সেক্রেটারী ও পাট সমিতির চেয়ারম্যান কোনও সভায় উপস্থিত থাকিলেই সেটা আর গোপন হইতে বা থাকিতে পারে না, এটা আমি সবিনয়ে মানিয়া লইলাম। কিন্তু জিনিসটা কি হইয়াছে, দেশবাসীকে সেটা বুঝাইয়া দেওয়া তাদের উচিত ছিল। এ কাজটি তাঁরা করেন নাই। রোম হইতে প্রকাশিত রিপোর্টটি নিশ্চয়ই তাঁরা পড়িয়াছেন। প্রস্তাবিত গবেষণা কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত হইবে। এটাকে লোভনীয় করিবার উদ্দেশ্যে হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে, বাজেটের প্রায় ৫০ ভাগ টাকাই গবেষণা কেন্দ্রে খরচ করা হইবে। কথাটার মধ্যে একটু কারচুপি আছে। বাজেটের শতকরা দশ টাকা হেড অফিস পরিচালনে ব্যয় হইবে। বাকী নব্বই টাকাই 'কম-বেশী' 'প্রায়' আধাআধি ভাগ করিয়া ঢাকা ও দিল্লীতে ব্যয় করা হইবে। তার মানে দিল্লী পাইবে পঞ্চাশ আর ঢাকা পাইবে পঁয়তাল্লিশ। শুধু ব্যয়ের দিক হইতেই যে দিল্লী বড় শরীক, তা নয়। এলাকা ও ক্ষমতার দিক হইতেও বড় তরফ। ঢাকা হইবে রিসার্চ সেন্টার গবেষণা কেন্দ্র। দিল্লী হইবে প্রমোশনাল সেন্টার, প্রচার ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কার্যতঃ হইয়াছেও একটা দুই শরীকের পরিবার। নেপাল ও থাইল্যাণ্ড সেই 'দত্ত কারো ভৃত্য' নয় সংগে এসেছে।' একটা বিচার-বিমর্শ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে 'জুট ইন্টারন্যাশনাল' মোটেই ইন্টারন্যাশনাল নয়। পাট, কেনাফ ও এই জাতীয় তন্তু উৎপাদনকারী দেশ দুনিয়ায় ষোলটি। যে সব দেশ শুধু পাট অথবা পাট ও কেনাফ দুইটাই উৎপাদন করে, এমন দেশের সংখ্যা নয়টি। তারমধ্যে মাত্র চারটিকে লইয়া এই জুট ইন্টারন্যাশনাল। ব্রাজিল, বার্মা ও ফরমোজাকে না ডাকিবার বা তাদের অনুপস্থিতির কোনও কারণ নাই। আর গণচীনকে ডাকিলে যে আসিত না, তাও মনে হয়না। গণচীন তার টেবিল-টেনিস খেলায় ফরমোজাকে দাওয়াত দিতেছে এবং সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আগেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের নজিরের অভাব নাই। তাছাড়া বাংলাদেশ ছাড়া জুট ইন্টারন্যাশনাল-এর সব দেশের সাথেই তো গণচীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। আর ব্যাপারটাও ত বাংলাদেশ গণ-চীনের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার হইত না। এটা হইত বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই এমন বহু দেশের সাথে জোট-নিরপেক্ষ আলজিয়ার্সে সম্মিলনীতে বাংলাদেশ যোগদান করিয়াছে। এ অবস্থায় ভারত ও বাংলাদেশের পরেই

যে গণচীন বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ, তাকে জুট ইন্টারন্যাশনাল-এ কেন নেওয়া হইল না, তার কোনও কারণ জানান হয় নাই।

এভাবে নয়টি দেশের মধ্যে মাত্র চারটিকে লইয়া জুট ইন্টারন্যাশনাল করা হইয়াছে। এই চারটির মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের উৎপাদন ও রপ্তানি বেশী বলিয়াই বোধ হয় বোর্ড অব ডাইরেক্টরেও বেশী আসন দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ বছরের জন্য বোর্ড গঠনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাতে ভারত চারজন, বাংলাদেশ চারজন, নেপাল ও থাইল্যাণ্ড একজন করিয়া মেম্বার পাইবে। দুইটি আন্তর্জাতিক সংস্থা দুইটি আসন পাইবে।

জুট ইন্টারন্যাশনালের মোট বার্ষিক বাজেট হইবে এক কোটি ডলার। চারটি মেম্বার দেশ এর অর্ধেক মাসে পঞ্চাশ লাখ ডলার বহন করিবে। চারটি দেশের চাঁদার পরিমাণ হইবে পাট-কেনাফ হইতে অর্জিত বিদেশী মুদ্রার শতকরা এক টাকা। ১৯৬৮-৭০ এই তিন বছরের আয়ের গড়ের উপর এই হার ধরা হইবে। এই মুদ্দতে ভারতের রপ্তানী গড় কম-বেশী পাঁচ লাখ টন, আর বাংলাদেশের গড় এগার লাখ টন। কাজেই বাংলাদেশের দেয় চাঁদার পরিমাণ হইবে ভারতের দ্বিগুণ। আমাদের বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের দেয় চাঁদার পরিমাণ হইবে বার্ষিক প্রায় তিন কোটি টাকা। যদি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও পাট ব্যবহারকারী দেশগুলি প্রস্তাবিত অর্ধেক বাজেট বহন না করে, তবে মেম্বার দেশসমূহের চাঁদার হার বাড়াইতে হইবে। আলোচ্য সম্মিলনীর কার্য-বিবরণীতে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ তাঁদের সাধ্যমত চাঁদা দেয়ার ওয়াদা করিলেও পাট ব্যবহারকারী দেশের প্রতিনিধিরা কোনও ওয়াদা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁদের কথা এই, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাঁদার মধ্যেই তাদেরও অংশ আছে। আলাদা করিয়া চাঁদা দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হইবে। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পাট ব্যবহারকারী দেশসমূহ চাঁদা দিতে সম্মত না হইলে মেম্বর দেশ চারটি কিভাবে বাজেট পূরণ করিবেন সেই চিন্তা করিতে থাকুন।

যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, সম্মিলনীর প্রস্তাবমত চাঁদা পক্ষগণের সবাই দিতে রাজী হইবেন, তবে বাংলাদেশকে প্রতি বছর তিন কোটি টাকা জুট ইন্টারন্যাশনালের তহবিলে দিয়া যাইতে হইবে। তবে প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, এত টাকা প্রতিদান বাংলাদেশ পাইবে কিনা? ধরা যাক, এই তিন কোটির শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ গবেষণা কাজে ঢাকায় ও বাকী

পঞ্চান্ন টাকা প্রপ্যাগেণ্ডা ও মার্কেটিং-এ দিল্লীতে খরচ হইবে। দিল্লী হইতে প্রচার ও বাজার সন্ধান চালাইলে বাংলাদেশের পাটের কি লাভ হইবে, সেটা আগাম গণনা করার সাধ্য আমার নাই। তবে ৪৫ ভাগ, মানে তিন কোটির সোওয়া কোটি টাকায় পাট গবেষণার কাজ কতটুকু হইবে, সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যায়।

১৯৬০ সালে যে জুট ইনকুয়ারী কমিশন রিপোর্ট দিয়াছিল, তাতেই বলা হইয়াছিল, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও বেলজিয়ামে ৫২ প্রকারের পাটজাত দ্রব্য আবিস্কার করা হইয়াছে। সে সবের অনেকগুলিই বাংলাদেশের গবেষণাগারে হইতে পারে। তাছাড়াও বাংলাদেশের জুট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও সায়েন্টিফিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরির পাট বিজ্ঞানীরা পাটের শোলা, পাটের শিকড়, পাটের বীজ, পাটের পাতা, এবং বরবাদী পাট (জুট ওয়েষ্ট) হইতে পেপার পাল্প, বোর্ড পাল্প, রেয়ন পাল্প, ডিসলভিং পাল্প, লং ফাইবার পাল্প, মেকানো-কেমিক্যাল পাল্প, উন্নত মানের নিউজপ্রিন্ট পাল্প, পাট তুলা ও পাট পশম (কটনিং ও উলিং অব জুট) ইত্যাদি বহু প্রকারের পাটজাত দ্রব্য ও ওষুধপত্র তৈয়ারীর ল্যাবরেটরী-টেষ্টের আবিস্কার করিয়াছেন। এগুলি এখন ফিল্ড টেষ্ট বা ক্ষেতে-খামারে টেষ্ট করিবার অপেক্ষায় আছে। পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা এ যাবত কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাহিয়া কত আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন। এক কোটি দেড় কোটি টাকা সাহায্য পাইলেই আমাদের বিজ্ঞানীরা এই সব আবিস্কারের ফিল্ড টেষ্ট করিয়া এতদিনে এর অনেকগুলিই কমার্শিয়াল ইউটিলাইজেশনের, বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী বিপুল উৎপাদনে পরিণত করিতেন। এই দুই গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের মত এই যে, জুট ইন্টারন্যাশনালে বাংলাদেশ সরকার যে প্রায় তিন কোটি টাকা বার্ষিক চাঁদা দিবেন, তার পুরাটা হইলে ত কথাই নাই; অর্ধেক টাকা পাইলেও তারা তাদের আবিস্কৃত দ্রব্যাদির ফিল্ড টেষ্টের কাজ সমাধা করিতে পারেন। এই অবস্থায় এঁদেরে অর্থ সাহায্য না করিয়া জুট ইন্টারন্যাশনালকে এত টাকা চাঁদা দেওয়ার স্বার্থকতা কোথায়? বাংলাদেশের চাঁদার অর্ধাংশ দিয়া এখানে জুট ইন্টারন্যাশনাল-এর যে গবেষণা কেন্দ্র হইবে, তার পরিণামে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে: (১) আমাদের জাতীয় গবেষণাগারগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে; (২) আমাদের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের সাধনা গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক মালিকানায় চলিয়া যাইতে পারে; (৩) জাতীয়

গবেষণা ও আন্তর্জাতিক গবেষণায় ওভারল্যাপিং তার মানে অপচয় হইতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেই মোটামুটি বোঝা গেল যে, জুট ইন্টারন্যাশনালের গবেষণা কেন্দ্র হইতে বাংলাদেশ আশানুরূপ সাহায্য নাও পাইতে পারে। বরঞ্চ কোন কোন দিকে ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। আরও বোঝা গেল যে, জুট ইন্টারন্যাশনালের আকৃতি-প্রকৃতি ও প্রতিনিধিত্ব এটাকে শেষ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ ও নেপালের ত্রিদেশীয় সংস্থায় পরিণত করিতে পারে। জুট ইন্টারন্যাশনালের এলাকা শেষ পর্যন্ত যদি এই উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ হয়ও তথাপি এর দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি। এটাই আমার মত। গত নিবন্ধেই আমি সে কথা বলিয়াছি। আমি বরাবর ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মৈত্রী সহযোগিতার মাধ্যমে উপমহাদেশীয় ইকনমিক কমিউনিটির কথা বলিয়া আসিতেছি। এই আকার-প্রকারের জুট ইন্টারন্যাশনাল তার বিরোধী ত নয়ই, বরঞ্চ প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। সরকার আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করিতেছেন বলিয়াও আলোচ্য হ্যাণ্ডআউটে বলা হইয়াছে। এটা খোশখবর। কিন্তু এটা করিতে গেলে গত নিবন্ধে আমার প্রস্তাব মত ভারত-বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হইবে। সে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাটের প্রমোশনাল সেন্টারটি দিল্লীতে স্থাপিত হওয়ার কোন স্বার্থকতা নাই। স্মরণ রাখা দরকার যে, পাকিস্তানী আমলে আমাদের জুট বোর্ডই একটি আন্তর্জাতিক প্রমোশনাল সেন্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করার দাবী ফাও-এর কাছে পেশ করিয়াছিল ১৯৬৮ সালে। বাংলাদেশের দাবী কাজেই অগ্রগণ্য।

ইত্তেফাক
৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

আবদুস সালামের একটি সম্পাদকীয় ও কলাম

THE SUPREME TEST

The Awami League Government is today in a peculiar position. Although the party was elected overwhelmingly by the people, the Government we have today is not an elected, representative and constitutional Government, because of the fact that there is no constitution yet and there is, therefore, no democratic legal basis for its existence. It holds office by virtue of coming out victorious in a revolutionary war and is therefore a revolutionary, provisional government.

At one stage Prof. Muzaffar Ahmed, chief of the only splinter group of NAP, had suggested that there should be a national government composed of the various political elements which participated in the revolutionary war. Later on however, he and others such as Maulana Bhashani agreed to give their support to the Government especially for bringing about normalisation in the country. The Awami League had the right to claim that they were the chosen representative of the people and therefore politically they had the right to form the government and since a constitution cannot be had overnight and conditions in the country were far from normal, it was imperative to form a government, take steps to create normal conditions and then to call the Constituent Assembly and make the basic law of the State. It has to be admitted that conditions are not yet absolutely normal and esxtra legal actions have to be taken to meet the day-to-day situation. But one hopes no avoidable time will be lost in giving a legal and constitutional shape to the basic structure of our State. The people voted for the Bangabandhu, and he has said that Bangladesh will be a democracy with socialism and secularism as its guiding lights. Both he and the Awami League have been pledged to democracy for long. In fact, their fight against the then regime of Pakistan was for the restoration of democracy and fundamental human rights. Therefore, they cannot ignore these two basic requirements of a modern state. And these can be guaranteed only by a constitution and a government machinery which will contain within itself the checks and balances of a democracy.

We believe it is possible to reconcile democracy in the true sense with a socialistic pattern of our economy. The problem is to preserve individual human rights within a framework of social obligations and an economic system that shall eliminate exploitation.

There can be no state within a state. In other words, all foci of real power must be within the constitutional framework and subject to discipline of the law. The government must assume the ultimate responsibility for law and order and cannot for any reason whatsoever abdicate it for any purpose to any particular group outside the governmental framework. Whilst therefore the principle of individual freedom requires that there have to be checks and balances, there has also to be the supremacy of the law with guaranteed judicial impartiality. The principle of socialism means that individual rights and privileges are subject to the overriding interests of society as a whole and it also involves the necessity to eliminate exploitation of man by man, under whatever name it may seek to exist. In making the constitution this aspect of the problem with which we are faced today must be kept in mind.

The public services today are in a demoralised state. Many factors are responsible for this, not the least of which was the ten months of sadistic brutality and lawlessness encouraged by the then regime itself. The Awami League in power cannot do itself what it condemned in the previous regimes. The permanent services should as far as possible, be left alone. Mr. Monem Khan used to issue directives straight to the village daroga. If we replace one Monem Khan by thousands of them that will be no improvement.

Sheikh Mujib loves his people and the people love him in return. It is for him now to take on the leadership of the whole nation and put it on the road to orderly progress. He probably does not know how strong he is. His strength comes from the people and not from any particular group, clique or vested interest. In a way he is now facing the supreme test of his greatness.

The Bangladesh Observer
March 15, 1972

IDLE THOUGHTS

We knocked repeatedly at the first-story door of a new house in a Dacca suburb, set apart from the rest, lonely and cheerless, like a lost child in a wilderness. When at length the door was opened, we peered into the semi-darkness of the room within and were startled to see what at first glance appeared to be an apparition, a spectre. On a closer view it was a small woman dressed severely in black with only a bead necklace around her gleaming throat, her penetrating eyes set off by the pallor of her face. She still seemed to be a being from another world, at least a votaress in a temple devoted to a long-forgotten cult. On further acquaintance she appeared to be exactly that. She was a dedicate to her art, the art of sculpture.

In that cluttered room I saw many examples of her work. An East Pakistani girl had braved the displeasure of her society, had learnt at the feet of Epstein, had imbibed the air of the studios of London, Paris and Rome, had fought alone in those strange lands, in unfamiliar surroundings in cold and discomfort, to justify her existence as a dreamer, as an artist and as human being with a creative urge which her country and society had never taken to kindly.

Even now she lives alone with and for her art. Disappointments and discouragements have been her lot even in her own country, among her own people. A parvenu who perhaps wanted a pseudo-Praxiteles got from her an almost genuine Brancusi, and she was denied what was her due. The artist is often misunderstood. A freize that she executed for a public building was denounced as unrepresentative of our art, and foreign to our cultural aspirations. And this was the result of evaluations made by persons (including the present writer) who knew nothing of sculpture and did not pretend to be connoisseurs of this art. Indeed we all are parvenus of culture, and it would perhaps have been well if we had been modest enough to recognise the possibility that our appreciation of art has to follow an intensive exposure to works of real merit.

There was a time when our classical music was anathema to me. It was just a rigmarole consisting of discordant noises. Hearing such music with a conscious effort sustainedly for long, I have come to enjoy the inner cadence, the rythmic sound behind the noise, the glimmering of meaning behind the cacophony. Not that I am a trained musician able to distinguish between the ragas or analyse the difference in understandable language between a kheyal and a dhrupad. But I can enjoy musically organised sound without words. In attaining this aptitude, however, imperfectly, I have lost my capacity to enjoy the common wordly music of the street. Similarly the capacity to enjoy great literature can and ought to be acquired by training and practice. There can be no royal road to the appreciation of great literature, great painting and great sculpture. I have not yet been able to understand and enjoy classical European music. This I ascribe to my failure to get the requisite training and the long exposure to it, that could have made the training effective. I believe there is something intrinsically great in that music.

But artists who think that they have made a real contribution to their art should not complain if philistines like us, fail to give them the praise and appreciation that they think are their due. Our eyes are not their eyes ; our ears are not their ears ; our hearts and minds are not their hearts and minds. They think they are different and we agree with them that they are a class apart, that they belong to a different species altogether.

I don't know if she is a great sculptress and I will not presume to pass judgement on her work. But I will certainly admit the possibility that it is significant. I go further and say that it is our duty to go and see the exhibits of her work and ask ourselves the question : Have these any meaning for us?

The Pakistan Observer
July 15, 1960

মোসাফির

রাজনৈতিক মঞ্চ

অপ্রাসংগিক কথার জবাব দিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানীরা বর্ণহিন্দুর সম্মুখে জুতা পরিধান করিতে পারিত না বলিয়া ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান সম্প্রতি ঢাকায় যে উক্তি করিয়াছেন, তার জবাব দিবার জন্য পাঠকদের তরফ হইতে আমাদের নিকট প্রস্তাব আসিয়াছে। কেহ কেহ নিজেরা জবাব লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের এই উক্তিকে ইতিপূর্বেই আমরা দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। কেন তিনি এই মুহূর্তে এ ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করিলেন, তাহা আমাদের নিকট আজও দুর্বোধ্য। মাত্র এই উক্তিই নয়, তিনি এবারে পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে আরও কতিপয় অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিয়াছেন।

তাসখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হইবার পর এই সেদিনও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে প্রকাশ্যে বিভিন্ন বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতাদের সম্পর্কে কত প্রশংসাবাণীই না উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। মনে হইতেছিল, এই বুঝি আমাদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির ও দুর্দিনের অবসান হইতে চলিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এবারে পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আগমন করিয়া সেই আশা ধূলিসাৎই করেন নাই, বিরোধীদলের নেতাদের সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য ও কটাক্ষ করিয়াছেন যাহা অনেকের নিকটই শুধু অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিতই নয়, জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে বাংলার মুসলমানরা তাদের মুক্তিদাতা ও মাথার মণি বলিয়া গণ্য করে সেই পরলোকগত নেতাদের প্রতিও আক্রমণ করার কি প্রয়োজন ছিল ? কি উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ আচরণ করিলেন, বলিতে পারি না। তবে তাসখন্দ ঘোষণার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতাদের প্রশংসা করিয়া নিজের গা রক্ষার ও ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন ইহা এক্ষণে স্পষ্ট।

পরাধীন আমলে কে কি করিয়াছে, আজ তাহা নিয়া বিতর্কের সৃষ্টি করাও এই মুহূর্তে অবান্তর। একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইলে দুর্বলের উপর সবল কি আচরণ করে, তাহা কাহারও অজানা

নাই। আজ নিজেদের দিকে তাকাইলেই তার দৃষ্টান্ত নজরে পড়িবে। নতুবা সমতা ও সমান অধিকারের প্রশ্ন তুলিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে আজ গালাগালি ও হুমকি শুনিতে হয় কেন? তথাপি বর্ণহিন্দুর কথা যখন তোলা হইয়াছে, তখন প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিতে হয়। বাংলা দেশে বৃটিশ শাসন আমলে বৃটিশের আনুকূল্য লাভ করিয়া যাঁরা সমাজ জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে এক শ্রেণীর বর্ণ হিন্দু ছিলেন, তাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। বাংলাদেশে একদা তাঁরাই ছিলেন জমিদার, মহাজন এবং সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তবে ইহাও সত্য যে, তাঁরা শুধু মুসলমানদেরই দাবাইয়া রাখেন নাই, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদেরও দাবাইয়া রাখিতেন। ইহা শোষণ বিজ্ঞানের চিরন্তন ধর্ম। কিন্তু মুসলিম-প্রধান বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল: মীরজাফর ব্যক্তিস্বার্থে রবার্ট ক্লাইভের সহিত হাত মিলাইয়া বাংলার প্রতি যখন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তখন তারই পাশে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মীরমদন, মোহনলালের মত দেশ-প্রেমিকরা বীরের মত আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। বাংলার বারো ভুঁইয়ারা দিল্লীর মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন; তাঁরা বাংলাকে স্বাধীন রাখিয়াছিলেন। তিতুমীর প্রমুখ বীরসন্তান বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। বশ্যতা স্বীকার না করায় বৃটিশরা বাংগালীদের উপর চরম নির্যাতন চালাইয়াছিল, বাংলার মুসলমানকে Hewers of wood and drawers of water অর্থাৎ কাঠকাটা ও পানিটানার জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু বাংগালী মুসলমানদের প্রতিজ্ঞা ছিল শির দিব, নাহি দিব আমামা। এই নির্যাতন ও বৈষম্য সত্ত্বেও বাংগালী মুসলমানরা কিভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, কিভাবে ১৯৩৭ সাল হইতে মুসলমানরা বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা বাংগালীদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া তাহা সকলেরই জানা আছে। বর্ণহিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া জমিদারী ও মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানরাই বিরামহীন, আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে। বাংলার প্রজা-আন্দোলনে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, স্যার আবদুর রহীম প্রমুখ নেতার অবদানের কথা বাংলার ঘরে ঘরে জানা আছে। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষককূলের চেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে ফজলুল হকের অবদান ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী; আবার বাংলার রাজধানী কলিকাতায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা যে মর্যাদা

ও গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল, (এবং যার সুফল গোটা বাংলার মুসলমানরা ভোগ করিয়াছিল) সেক্ষেত্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাংলার জমিদারী মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে শুধু মুসলমানরাই সংগ্রাম করেন নাই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষ চন্দ্র বসুর মত উদার, অসাম্প্রদায়িক বর্ণহিন্দু নেতাদেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান ছিল। এ সংগ্রামের ফলেই ১৯৩৬ সালে শেরেবাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সেই আমলেই প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন পাশ হয় ও ঋণ সালিসি বোর্ড চালু করা হয়। সেই মন্ত্রিত্বের আমলেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ফ্লুউড কমিশন গঠিত হয়। বাংলার মুসমানরা বর্ণহিন্দুদের সম্মুখে জুতা পরিধান করিতে পারিত না বলিয়া আজ যে ইংগিত করা হইতেছে, বাংলার সেই মন্ত্রিসভার একজন মুসলিম প্রধানমন্ত্রীর অধীনে শুধু তফসিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই নয় বিশিষ্ট বর্ণহিন্দুরাও যোগদান করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নলিনীরঞ্জন সরকার, স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রমুখ বর্ণহিন্দু মন্ত্রীর নাম করা যাইতে পারে। মুসলিম নেতৃত্বে গঠিত পরবর্তী মন্ত্রিসভাতেও মিঃ তুলসী গোস্বামী, মিঃ বরদা প্রসন্ন পাইন, নরেশচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ বর্ণহিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। চাকুরী-বাকুরীর ক্ষেত্রে তৎপূর্বে মুসলমানরা বহু পিছনে পড়িয়া থাকিলেও ১৯৩৬ সালে মন্ত্রিসভা কায়েম হইবার পরে শিক্ষার দিক দিয়া মুসলমানরা হিন্দুদের অপেক্ষা অনগ্রসর থাকা সত্ত্বেও মুসলমানের জন্য সর্বক্ষেত্রে অর্ধেক চাকুরী রিজার্ভ করা হয়। একশ্রেণীর বর্ণহিন্দুরা উহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় এই ব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত মানিয়া নেয়। প্রসংগতঃ চাকুরীর হার নির্ধারণকালে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তাতে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জী ৫০:৫০ ফর্মুলা উদ্ভাবন করেন। এইজন্য উগ্রহিন্দুরা তাঁর নাম দিয়াছিল ফিফটি ফিফটি চ্যাটার্জী।

তাই এক কথায় বলিতে গেলে, বাংলার শাসন-ব্যবস্থায় সেদিন মুসলমানরা শুধু ভাগ্যনিয়ন্তাই ছিলেন না, জমিদারী-মহাজনী সব কিছু কায়েমী স্বার্থের মূলোৎপাটনও করা হইয়াছিল সেই মুসলিম-প্রভাবিত শাসন আমলে। আর ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলার মুসলমানরা উপেক্ষার আসন হইতে ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল নিজেদের শক্তির বলে, বাহিরের কাহারও সাহায্যে নয়। আজ যাঁহারা বাংগালীর প্রতি তথা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অনুকম্পার সুরে কথা বলেন,

তাঁরা কিংবা পূর্বপুরুষরা দুর্দিনে বাঙ্গালী মুসলমানদের কোন প্রকার সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন কি ? বরং যে অঞ্চল লইয়া আজ পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত, সেই অঞ্চলের একটি সুবিধাবাদী মহল বিদেশী প্রভুদের সহিত হাত মিলাইয়া কিভাবে নিজেদের ভাগ্য গড়িয়াছিলেন, পাকিস্তান আন্দোলনকালেও তাঁরা শিখ ও অন্যান্য অমুসলিম নেতার কতখানি প্রভাবাধীনে ছিলেন, কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আজও সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্রের বগলদাবা হইয়া রহিয়াছেন, তার ইতিবৃত্ত আমরা এক্ষণে বর্ণনা করিতে চাই না। বরং পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত ভাইদের মুক্তি সাধনে কোন প্রকার সহায়তা করিতে পারিলে আমরা নিজদিগকে ধন্য মনে করিব। তাই আজ বাঙ্গালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে অহেতুক যে-সকল অপবাদ দেওয়া হয়, তাতে আমাদের ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবার কিছু নাই। যে সমাজে মুষ্টিমেয় লোক অবৈধভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই সমাজে জনগণকে দাবাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে জনগণের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী মহল হইতে নানা ধরনের অলীক কাহিনী রচনা করা হয়। সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে শুধু কুৎসিত ইঙ্গিত করা হয় নাই, তাঁর বিরুদ্ধে 'অন্ধকূপ হত্যার' ভুয়া কাহিনীও রচনা করা হইয়াছিল, তা আজ কে না জানে। কায়েমী স্বার্থের মূলোৎপাটন করিয়া দেশে সুষ্ঠু রাজনীতি ও গণকল্যাণমুখী সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন করিতে সক্ষম হইলেই এই ধরনের গালাগালি ও কথাবার্তার আপনাআপনি অবসান হইবে। তবে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখে এই ধরনের কথাবার্তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি হয়ত বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যুক্ত বাংলা গঠন করা হইলে বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাগ্যে আবার দুর্দশা নামিয়া আসিবে। এই সতর্কবাণীও সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক ও অপ্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ 'যুক্ত বাংলা' গঠনের খেয়াল কিংবা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নাই। দ্বিতীয়তঃ এই অঞ্চলের লোকদের কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল হইবে, সেটুকু বিচার করার বুদ্ধিসুদ্ধি তাদের আছে। আর আছে বলিয়াই পাকিস্তান আন্দোলনে তারাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই অঞ্চলের নির্বাচনী ফলাফলের উপরই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের

সুবিধাবাদী, স্বার্থ-সর্বস্ব এবং তল্পিবাহক শ্রেণীর লোকদের প্রাধান্য থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি সেই নির্বাচনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও বাংলাদেশের নির্বাচনে অপূর্ব সাফল্যের জন্যই তারা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছে। আজিকার আসল সমস্যা হইল: লাহোর প্রস্তাব তথা ছয় দফাভিত্তিক দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের দাবী উঠিয়াছে। ইহার সহিত পরাধীন আমলে কে বর্ণ হিন্দুর সামনে জুতা পরিতে পারিত না, বা পাল্টা অভিযোগ, কারা-বিদেশী শাসকদের জুতা পালিশ করিত তার কি সম্পর্ক? ইহা শুধু অবাস্তব, অবাঞ্ছনীয় নয়, বাঙ্গালী মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করারও শামিল। যে যাহাই ভাবুক না কেন, লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার পুনর্গঠনে পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৯ জনের দাবী। এই দাবী নিয়া আলোচনা করা হউক, জাতীয় স্বার্থে ইহার কোথাও কোন সামঞ্জস্যবিধান প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা সমর্থন অথবা ইহার বিরোধিতা করি নাই। ধীরস্থিরভাবে নিজেদের অভিমত গঠন করা ছাড়া আমরা দেশের বুদ্ধিজীবী, যুব সমাজ, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং সর্বসাধারণের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। লক্ষ্য করিলাম যে, সরকারী তরফের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হইবার পূর্বে কতিপয় বিরোধী দল ৬-দফা প্রোগ্রামের প্রতি আক্রমণ শুরু করিলেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রমুখরা ৬দফা প্রোগ্রামকে 'এক দফা' প্রোগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিলেন যে, ইহা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দূরভিসন্ধি। বুদ্ধিজীবী, যুব সমাজ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেও ইহার পাল্টা ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যে সকল বিরোধী দলীয় মুখচেনা নেতা ৬ দফার বিরোধিতায় কোমর বাঁধিয়া নামিলেন, তাঁদের শাসন আমলেই বৈষম্য এবং ঠকাঠকির গোড়া পত্তন হইয়াছিল, দেশবাসী তাহা সম্যক অবগত আছে। ৬দফার বিরুদ্ধে যখন তাঁহারা মারাত্মক অভিযোগ আনয়ন করিলেন, তখন ৬দফা কর্মসূচীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য আওয়ামী লীগও বিশেষ তৎপর হইলেন এবং প্রদেশের জেলা হেড কোয়ার্টার ও সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সভা-সমিতি অনুষ্ঠান করিয়া তাঁরা ৬দফার জনসমর্থনের প্রমাণ করিলেন। ৬দফা কর্মসূচী সবাই সমর্থন করুক আর না করুক সত্যের খাতিরে সকলকে স্বীকার করা উচিত যে ৬দফা দাবীতে অনুষ্ঠিত শেখ মুজিবের প্রত্যেকটি জনসভার অভূতপূর্ব জনসমাবেশে বিরোধীরা প্রদেশের কোথাও অনু-

রূপ জনসভা অনুষ্ঠান করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। প্রসঙ্গতঃ পররাষ্ট্র সচিব জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের সহিত ৬দফা ইস্যুতে 'মোকাবেলা সভার' (কনফ্রন্টেশন মিটিং-এর) প্রস্তাব দিয়াও কিভাবে উহা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইল, তাহাও দেশবাসীর চক্ষু এড়ায় নাই। যাই হউক,- জনমত সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াই ৬দফার প্রবক্তারা গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়া সাবধানতার সহিত এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা শতকরা ৩০টি ভোট লাভ করিলে তাঁরা রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। বস্তুতঃপক্ষে ৬দফার প্রতি যে একটানা জনসমর্থন লক্ষ্য করা যায়, তাতে নিরপেক্ষ লোক একথা বলিতে পারেন যে, গণভোট অনুষ্ঠিত হইলে ৬দফার অনুকূলে শতকরা অনুন্য ৯০টি ভোট লাভ সম্ভব হইবে।

৬দফা প্রস্তাবের এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ অবশ্য কোন ব্যক্তি এমনকি কোন দল বিশেষ নয়। আজ দেশবাসীর সম্মুখে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং আঞ্চলিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, ৬দফার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেই বাঁচা-মরার সমস্যা সমাধানের পথ নিহিত রহিয়াছে, ইহা সর্বশ্রেণীর জনগণের বিশ্বাস। ৬দফার যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের প্রধান দুর্বলতা হইল যে তাঁরা ৬দফার বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিতেও ভয় পান, তাঁদের মুখে একটি মাত্র শ্লোগান যে, ইহা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবে। কিন্তু নিরপেক্ষ পর্যালোচকেরা লক্ষ্য করিতেছেন যে, ৬দফা প্রোগ্রামে অপর কাহারও প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণের কিংবা অন্য কাহারও ন্যায্য স্বার্থে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রস্তাব নাই। ৬দফা কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হইল যে, অতঃপর উভয় অঞ্চলকে সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সুযোগ দিতে হইবে। ৬দফার প্রবক্তাদের অভিমত যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল স্ব স্ব সম্পদ দ্বারা সমান তালে উন্নতি অগ্রগতি সাধনের সুযোগ লাভ করিলে এবং উভয় অঞ্চল রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ করিলে তাহাই হইবে শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনের পক্ষে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ।

তাই কর্মপন্থায় মিল না থাকিলে বিরোধী দলীয় ঐক্য গঠন মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমরা জনমতের যেটুকু খবর রাখি, তাতে বলিতে পারি যে, জনগণও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে ঐক্য চান, শুধুমাত্র ঐক্যের খাতিরে অথবা অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য চান না। ইহা সকলকে উপলব্ধি করা উচিত যে, শেষ পর্যন্ত জনগণের সমর্থনের উপরই কর্মসূচী ভিত্তিক আন্দোলনের

সাফল্য নির্ভর করে। কতিপয় পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী বিরোধীদলের সমন্বয়ে ঐক্য গঠিত হইলে তাহা আর যা হউক দেশবাসীর ঈপ্সিত কর্মসূচীর সাফল্য নিশ্চিত করিতে পারে না। বরঞ্চ যাঁরা ৬দফার বিরোধী তাঁদেরসহ সকল বিরোধী দলের ঐক্য গঠিত হওয়ার অর্থ দাঁড়াইবে ৬দফাকে হিমাগারে গচ্ছিত রাখা এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও পুনরায় নিষ্ক্রিয়তা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। ৬দফার প্রবক্তা আওয়ামী লীগ হইলেও তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহা কোন দলীয় প্রোগ্রাম নয়, ইহা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম এবং এই প্রোগ্রামের প্রতি তাঁরা সকল দলের ও সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। ৬দফার আন্দোলন কোন দল বিশেষের ক্ষমতা দখলের আন্দোলনও নয়, ইহা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ৬দফার দাবী প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং দেশে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে পরই দলীয় রাজনীতির প্রশ্ন উঠিবে। সে সময় ক্ষমতাসীন দল এবং সকল বিরোধী দল স্ব স্ব প্রোগ্রাম ও বক্তব্য লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে হাজির হইবার সুযোগ পাইবেন এবং কোন দলকে ভোট দিবেন না দিবেন তার চূড়ান্ত মালিক হইবেন জনসাধারণ। সুতরাং ৬দফার আন্দোলনকে ক্ষমতা দখলের আন্দোলন বলিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও কোন অবকাশ নাই। বিরোধী দলের মধ্যে এন. ডি. এফ. এবং ন্যাপের প্রোগ্রামের সহিত ৬দফার বহুলাংশে মিল রহিয়াছে। আজ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে যখন শুধু ধর-পাকড় শুরু হইয়াছে তখন শুধু মৌখিক প্রতিবাদ নয়, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আওয়ামী লীগ ও এন. ডি. এফ-এর মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি থাকিলে তারও অবসান হইয়া নতুন সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। ন্যাপের প্রধান সমস্যা হইল তার পররাষ্ট্র নীতি এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ন্যাপ নিজেই দ্বিধাবিভক্ত। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা সকলেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী কিন্তু আমাদের নিকট দেশের প্রধান সমস্যার জন্য দেশের অর্থনীতির অসাম্য ও সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে; দেশে জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকৃত রহিয়াছে। সেই আভ্যন্তরীণ সমস্যাকেই আমরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করি। অনুন্নত যে-সকল দেশে শুধু পররাষ্ট্র নীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া আভ্যন্তরীণ সমস্যাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেই সকল দেশে বিশেষতঃ

ইন্দোনেশিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করিলে এক-চোখা পররাষ্ট্র নীতির উপর যাঁরা অধিক গুরুত্ব দেন তাঁদের ভুল ভাঙ্গিবার কথা। অবশ্য যাঁরা সমস্যা এড়াইবার জন্য কিংবা সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিবার জন্য বাহানা তুলিতে চান তাঁদের কথা ভিন্ন। তাই ন্যাপের চীনপন্থী ও রুশপন্থী বলিয়া কথিত দুইটি গ্রুপ যদি পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিতে সম্মত হন তাহা হইলে তাঁরাও ৬দফার সংগ্রামে বিনা দ্বিধায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। ৬দফার ভিত্তিতে যেখানে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হইয়াছে এবং ক্ষমতাসীনরা ধরপাকড় শুরু করিয়াছেন, তখন এই সংগ্রামের পথেই বিরোধী দলীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে। এই মুহূর্তে এই উদ্যোগ এন. ডি. এফ. ও ন্যাপ গ্রহণ করিলেই শোভনীয় হয়। যে যে প্রোগ্রামভিত্তিক আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে তার গতি নির্যাতন কিংবা কাহারও অসহযোগিতার দরুন প্রতিহত করা যায়না। তবে একই দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের ঐক্য গঠিত হইলে আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং লক্ষ্যে পেঁৗছা ত্বরান্বিত হয়।

সর্বশেষে রাজনৈতিক ঐক্যের ইতিহাসও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সাধিয়া-মাজিয়া ধরিয়া-বাধিয়া রাজনৈতিক ঐক্য গঠন করা যায় না। কর্মসূচী ও আন্দোলনের মধ্য দিয়াই গণ-ঐক্য গড়িয়া উঠে। বৃটিশখেদা আন্দোলনকালে কংগ্রেস শত চেষ্টা করিয়াও সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। কংগ্রেসের প্রোগ্রাম এবং ত্যাগী ও গতিশীল নেতৃত্ব কংগ্রেসকে গণপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। একইভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। কর্মসূচীর আকর্ষণ তৎকালীন মুসলিম লীগকে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।

ইত্তেফাক
২৭শে মার্চ ১৯৬৬

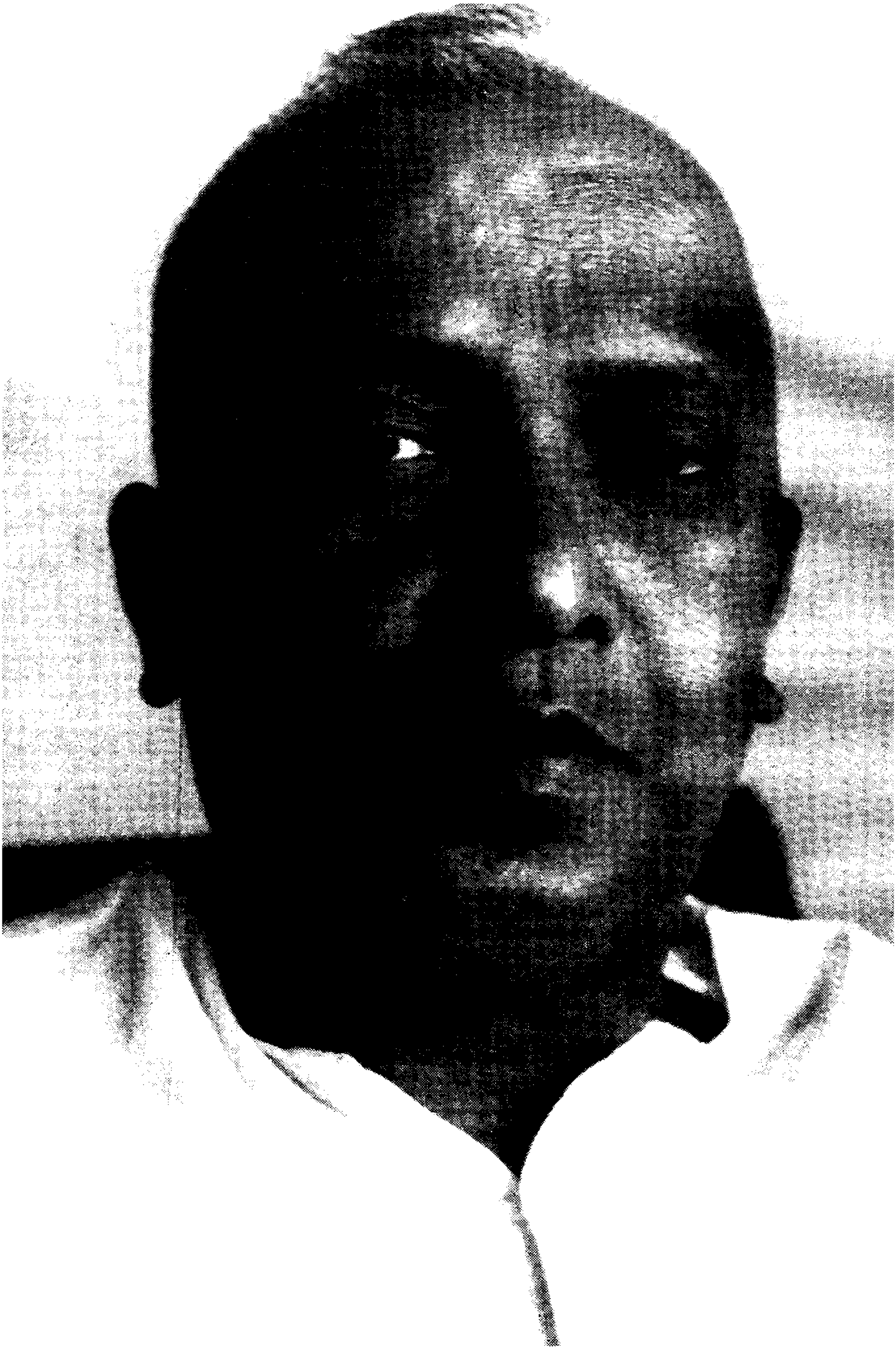

আবদুস সালাম

(১৯১০-১৯৭৭)

তফাজ্জল হোসেন

(১৯১১-১৯৬৯)

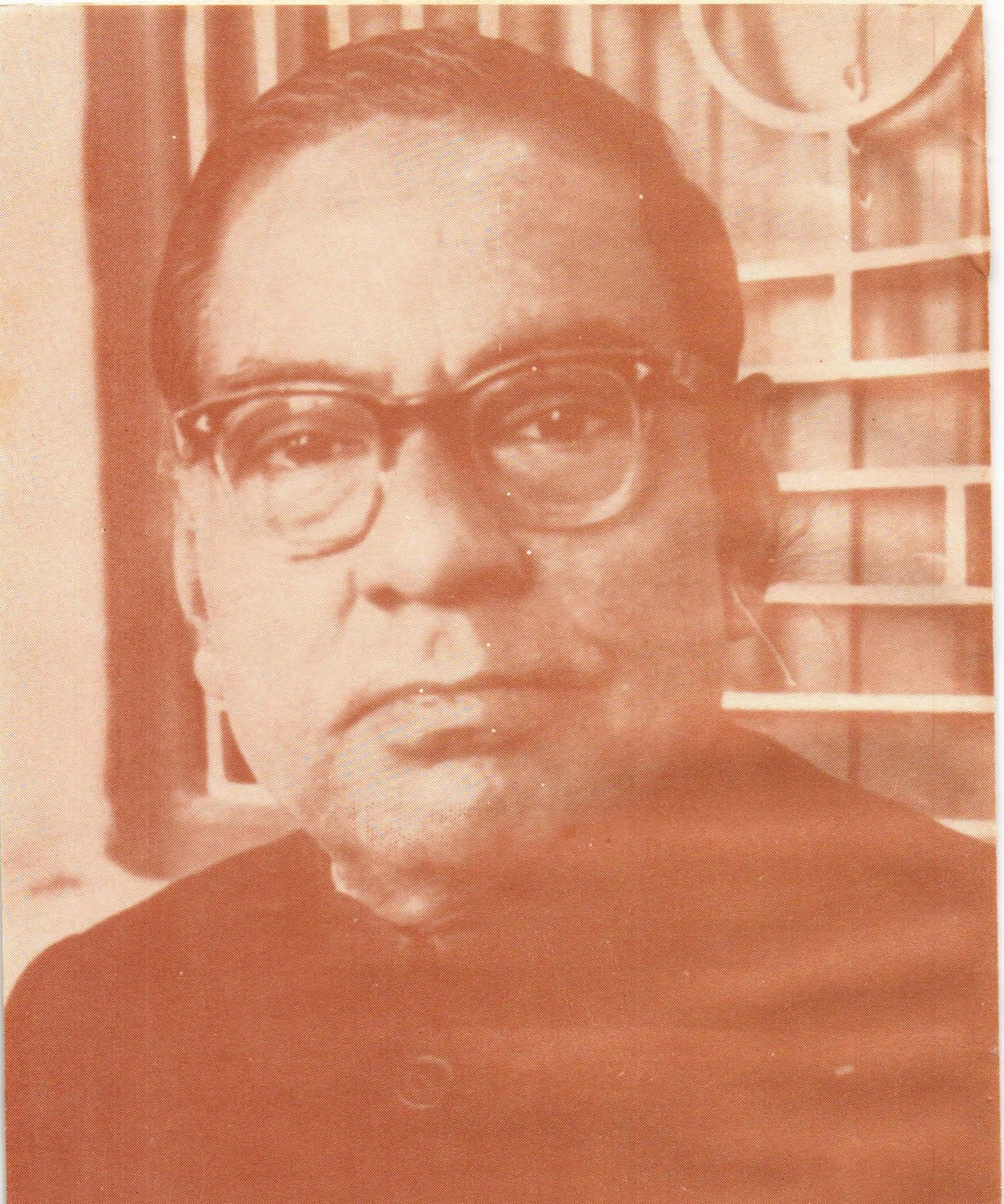

আবুল মনসুর আহমদ
(১৮৯৮-১৯৭৯)

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
(১৮৯৭-১৯৭৭)